জলদস্যু কাহিনী

হন্তারক নরদানব

রক্ত বাদল ঝরে

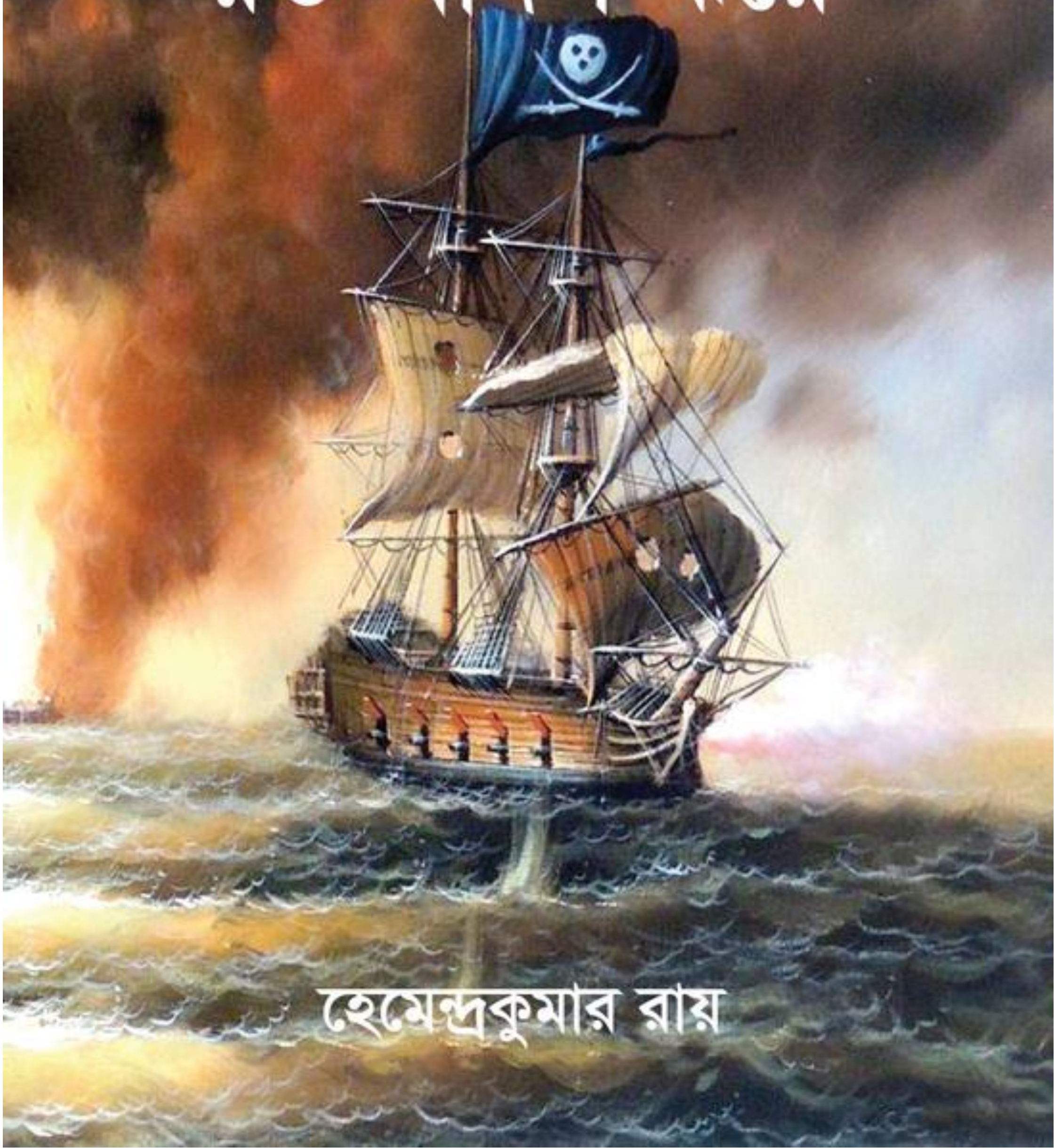

হেমেন্দ্রকুমার রায়

জলদস্যু কাহিনী

হন্তারক নরদানব

রক্ত বাদল ঝরে

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.dlobl.org

www.dlobl.com

হন্তারক নরদানব

পটভূমিকা

ইতিহাস যখন লিখিত হয়নি, জলদস্যু বা বোম্বেটের অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগেও দেখা যায় প্রাচীন মিশর, গ্রিস ও রোমের সমুদ্রযাত্রী জাহাজ বোম্বেটেদের পাল্লা থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি, বিশ্ববিখ্যাত রোমান দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকে পর্যন্ত একবার বোম্বেটেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল! ইংরেজিতে Pirate বলতে বুঝায় বোম্বেটে এবং গ্রিক Peirates থেকে ওই শব্দটির উৎপত্তি। উপরন্তু পর্তুগিজ Bombardier শব্দটি ভেঙে গড়া হয়েছে বাংলায় চলতি 'বোম্বেটে' শব্দটি।

প্রাচীন ভারতবাসীরাও সাগরযাত্রায় বেরিয়ে যখন-তখন ধরা পড়ত বোম্বেটেদের ফাঁদে। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের মাটিতে মুসলমানরা যে প্রথম ইসলামের পতাকা রোপণ করবার সুযোগ পায়, তারও মূলে ছিল ভারত সাগরের বোম্বেটেরাই। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনি, এখানে বলবার জায়গা নেই।

তারপর মধ্যযুগের ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ ও উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান বোম্বেটেদের ভয়াবহ অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এবং জলদস্যুতা পরিণত হয়েছিল একটি রীতিমতো লাভজনক ব্যবসায়ে। ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য বোম্বেটেদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রেও। আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বোম্বেটেদের প্রাধান্য এতটা বেড়ে ওঠে যে, তারা জল ছেড়ে ডাঙায় নেমেও দেশের পর দেশে হানা দিতে ভয় পেত না।

বোম্বেটেদের সাহস বাড়বে না কেন? বড়ো বড়ো ইংরেজ বোম্বেটে ইংল্যান্ডের রাজাদের কাছ থেকেও আশকারা পেয়েছে। অনেক বোম্বেটের জন্ম আবার সম্ভ্রান্ত পরিবারে। স্পেন বা ফ্রান্সের সঙ্গে যখন লড়াই চলত, ইংল্যান্ডের রাজারা তখন বোম্বেটেদেরও লেলিয়ে দিতে লজ্জিত হতেন না এবং তারাও প্রশ্রয়

পেয়ে স্পেন বা ফ্রান্সের যে-কোনও জাহাজের উপরে হামলা দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করত। হেনরি মর্গ্যান ছিল সতেরো শতাব্দীর এক কুখ্যাত ইংরেজ বোম্বেটে। সে কেবল জলপথে নয়, স্থলপথেও শত শত নরহত্যা করেছে এবং নির্বিচার লুণ্ঠনের পর বহু জনপদকে করেছে অগ্নিমুখে সমর্পণ। তাকে বন্দি করে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্লস তার সঙ্গে আলাপ করে এমন মুগ্ধ হলেন যে, শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, মর্গানকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করে জামাইকা দ্বীপের শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দিলেন।

জনৈক ইংরেজ বোম্বেটে একবার ভারত সাগরে এসে মোগলদের জাহাজের উপরে চড়াও হয়ে বাদশাহ আলমগীরের পরিবারভুক্ত দুইজন রাজকন্যাকেও বন্দিনী করতে ভয় পায়নি।

সুন্দরবন ছিল আগে বর্ধিষ্ণু লোকালয়, পরে পরিণত হয়েছে বিজন জলা-জঙ্গলে। মানুষের বিচরণ-ভূমি দখল করেছে হিংস্র পশুর দল। কারণ? পর্তুগিজ ও মগ বোম্বেটেদের অত্যাচার।

দুইজন মেয়ে-বোম্বেটেরও নাম বিখ্যাত-—আন বোনি ও মেরি রিড। জাতে ইংরেজ। তাদেরও গল্প অতিশয় চিত্তকর্ষক, কিন্তু আমরা বোম্বেটেদের ইতিহাস লিখতে বসিনি। ভূমিকার জন্য যতটুকু চাই, ততটুকু ইঙ্গিতই দিলুম, আপাতত এ সম্বন্ধে আর বেশি বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই। এইবার মূল কাহিনি শুরু করা যাক।

যার কথা বলব তার আসল নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড টিচ, কিন্তু কালোদেড় ডাকনামেই সে সর্বত্র পরিচিত (যেমন কুখ্যাত মুসলমান বোম্বেটে উরুজ পরিচিত ছিল 'লালদেড়ে' ডাকনামে)। সে কেবল স্পেন ও ফ্রান্সের শত্রুই ছিল না, নিজের জাতভাই ইংরেজদেরও সুবিধা পেলে ছেড়ে দিত না এবং সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ তার নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে সারা হত। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার উত্থান এবং পতন। আমেরিকায় তখন ইংরেজদেরই রাজত্ব।

নায়কের মঞ্চে প্রবেশ

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ। তারই উত্তরে আছে সাতশো আশি মাইল লম্বা বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—তাদেরও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। আমেরিকার দিকে যাত্রা করবার পর কলম্বসের চোখে পড়ে সর্বপ্রথমে বাহামা দ্বীপই।

বাহামার অন্যতম দ্বীপ নিউ প্রভিডেন্স এবং সেখানে ছিল বোম্বেটেদের জাহাজ ভিড়োবার এক মস্ত আড্ডা। আমাদের কাহিনির সূত্রপাত সেখানেই।

বোম্বেটেদের নিজস্ব এক কালো পতাকার নাম ছিল 'জলি রোজার'—তার উপরে সাদা রঙে আঁকা থাকত কোনাকুনি ভাবে রক্ষিত দুটো অস্থিখণ্ডের উপরে একটা মড়ার মাথা। সাগরপথের যাত্রীরা এই কৃষ্ণপতাকা বা 'জলি রোজারকে' সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ভয় করত। সৌভাগ্যের বিষয়, জলি রোজারের অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের বোম্বেটে-বহরের জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কাপ্তেন বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড। লোকের চোখ ভোলাবার জন্যে তাঁর জাহাজের উপরে উড়ছে এখন ইংল্যান্ডের রাজপতাকা বা 'ইউনিয়ন জ্যাক'। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দিলেই সেখানে ইউনিয়ন জ্যাকে'র জায়গা জুড়ে বসবে সর্বনেশে জলি রোজার'—কারণ তিনি হচ্ছেন একজন নামজাদা জলদস্যু!

হর্নিগোল্ড আজ কয়েকদিন জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন একজন সহকারী অধ্যক্ষের জন্যে। সহকারী অধ্যক্ষের অভাবে জাহাজের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন শুড়িখানা ও গুন্ডাপাড়ায় ঘুরেও তিনি মনের মতো সহকারী খুঁজে পাননি এবং সেই অভাবের জন্যে তার জাহাজ বন্দরের মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে।

নিজের মনেই গজ গজ করে তিনি বললেন, এমন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক বেটা মনের মতো পাষণ্ড গুন্ডার পাত্তা পাওয়া গেল না! আমার জাহাজের খুনে বদমাইশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে যে খোদ শয়তানের মতো ধড়িবাজ লোক দরকার!

আচম্বিতে কাছ থেকেই কে পাগলের মতো হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল—দস্তুরমতো শয়তানি হাসি!

চমকে উঠে নিজের পিস্তলের উপরে হাত রেখে হর্নিগোল্ড রুখে ফিরে দাঁড়ালেন—সত্যসত্যই কি তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছে স্বয়ং শয়তান?

কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম! এ যে কবির ভাষায়—পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!

জাহাজ-ঘাটার অন্যান্য লোকদের মাথা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে জেগে উঠেছে দৈত্যের মতো এক অসম্ভব মনুষ্যদেহ—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া! যেন বামনদের মাঝখানে এক বিরাট পুরুষ! তার মহাবলিষ্ঠ বিপুল বপুর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে লৌহকঠিন পেশির পর পেশির তরঙ্গায়িত গতি। সেই রুক্ষ কেশকণ্টকিত মুখে আগুনের ফিনকির মতো জ্বলছে দুটো কুচুটে কুতকুতে চক্ষু। মাথায় পুরু কালো চুল—এবং চোখনাকের পাশে ও তলায় সে কী কৃষ্ণ ও ঘন শ্মশ্রুর ঘটা! কয়েকটা যত্নরচিত বেণিতে বিভক্ত হয়ে সেই প্রকাণ্ড চাপদাড়ি ঝুলে পড়েছে একেবারে কোমর পর্যন্ত! কেবল বিউনি বেঁধেই দাড়ির পরিচর্যা শেষ করা হয়নি—তার উপরে তাকে আবার অলংকৃত করা হয়েছে রংচঙে সব রেশমি ফিতে দিয়ে! তার বক্ষ-বন্ধনীতে ঝুলছে তিনজোড়া পিস্তল এবং গলায় আছে সোনা ও রুপায় গড়া হার!

তারপর বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! মাথার টুপির তলা থেকে ঝুলে পড়ে কয়েকটা মৃদু-জ্বলনশীল পলিতা সেই ভীষণ মুখখানা অধিকতর ভয়াল ও

বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে গন্ধকের উগ্র গন্ধে! যেন অপচ্ছায়ামূর্তি থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে পড়লেন হর্নিগোল্ড! এমন ধারণাতীত দৃশ্য তিনি জীবনে আর দেখেননি।

পরমুহূর্তেই তার সন্দেহ হল যে, মূর্তি তাকে দেখেই হাসছে যেন বিশ্রী ব্যঙ্গের হাসি!

এই কথা মনে হতেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ড খেপে গিয়ে পিস্তল বাগিয়ে ধরে কুপিত কণ্ঠে বললেন, ওরে কালোদেড়ে শয়তান, আমাকে দেখে ঠাট্টা? মজাটা দেখবি নাকি?

কিন্তু কোনও মজাই দেখানো হল না—ধাঁ করে তার মনে পড়ে গেল একটা কথা। তাড়াতাড়ি গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, টিচ? তুমি কি এডওয়ার্ড টিচ?

—সঠিক আন্দাজ! আমি এডওয়ার্ড টিচই বটে, দেশ আমার ব্রিস্টলে।

—সবাই তোমাকে কালোদেড়ে বলে ডাকে তো?

পলিতার আগুন তখন দাড়ির উপরে নেমে এসেছে এবং চারিদিক ভরে উঠেছে গন্ধকের গন্ধের সঙ্গে চুল-পোড়া দুর্গন্ধে! কালোদেড়ে তার শ্মশ্রুর বেণিগুলো তাড়াতাড়ি কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমি কালোদেড়েই বটে! একটু আগেই আপনি যা বলেছিলেন আমি শুনতে পেয়েছি। জাহাজের বেয়াড়া বেহেড লোকগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে আপনার বেপরোয়া সহকারী দরকার?

কালোদেড়ে কথা কইতে কইতে মিট মিট করে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে দেখে তপ্ত হয়ে উঠল হর্নিগোল্ডের বুকের রক্ত! এমন দুঃসহ বেয়াদপি দেখলে যে-কোনও বোম্বেটেজাহাজের মালিক তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এই শ্রেণির একজন দুষ্ট ও ধৃষ্ট সহকারীর অভাবে তার জাহাজ অচল হয়ে পড়েছে বলে মনের রাগ মনেই চেপে তিনি

বললেন, তাহলে আমার জাহাজের অবাধ্য লোকগুলোর ভার আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম! কিন্তু তোমার ওই যাচ্ছেতাই জ্বলন্ত পলতেগুলো আর আমি সইতে পারছি না, ওগুলো নিবিয়ে ফ্যালো!

আগন্তুকের স্বরূপ

উপযোগী বাতাস পেয়ে জাহাজ বন্দর ছেড়ে ভেসে চলল আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দু-দিন পরেই কপ্তেন হর্নিগেন্ডের বুঝতে বাকি রইল না যে, সহকারীরূপে যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন, দুর্বৃত্ততায় সে শয়তানেরই জুড়িদার বটে! কাপ্তেনের ঘরের আওতাতেই দাঁড়িয়ে সে নোংরা, অশ্রাব্য ভাষায় চেঁচিয়ে, শপথ করে এবং টুপি থেকে ঝুলন্ত পলিতাগুলোতে আগুন লাগিয়ে যথেচ্ছ ভাবে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ছেড়ে ছয়-ছয়টা পিস্তল—কেউ হত বা আহত হল কি না তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না! একে তো সেই বিপুলবপু নরদানবের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে চমকে যায়, তার উপরে তার পাশবিক গর্জন শুনে এবং পিস্তলগুলো নিয়ে মারাত্মক খেলা দেখে মহাপাষণ্ড বোম্বেটেগুলো পর্যন্ত আতঙ্কে থরহরি কম্পমান দেহে জাহাজের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দেয় এবং তাদের মুখের ভাব যেন জাহির করতে চায়—ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি! কালোদেড়ের সামনে গেলে সকলেরই অবস্থা হয় ভিরু ভেড়ার মতো। একদিন সে হাঁক ছেড়ে ডাক দিলে, এই রাবিশের দল, আজ আমরা এক নিজস্ব নরক তৈরি করব! দেখব কতক্ষণ আমরা নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি। চল সবাই জাহাজের নীচের তলায়! ধ্রুম, ধ্রুম, ধ্রুম! পিস্তলের পর পিস্তলের ধমক! ভয়ে কেঁচোর মতো বোম্বেটের দল নীচের তলায় গিয়ে হাজির হতে দেরি করলে না। তারপর দুম-দাম করে বন্ধ করে দেওয়া হল সব দরজা। অগ্নিসংযোগ করা হল বড়ো বড়ো গন্ধকের কুণ্ডে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল না বটে, কিন্তু হুহু করে গন্ধকের ধোঁয়া বেরিয়ে ক্রমেই কুণ্ডলিত ও পুঞ্জীভূত হয়ে সেই রন্ধহীন বদ্ধ জায়গাটাকে করে তুললে ভয়ংকর দুঃসহ দৃষ্টি হয়ে যায় অন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে আসে রুদ্ধ, অন্তিমকাল মনে হয় আসন্ন! অমন যে বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও নরঘাতক বোম্বেটের দল, তারাও হাঁচতে হাঁচতে, কাশতে কাশতে, হাঁপাতে

হাঁপাতে ও মৃত্যুভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে কালোদেড়ের সামনে বসে পড়ে আর্ত স্বরে চ্যাঁচাতে লাগল—প্রাণ যায়, বাঁচাও! দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও!

দুই হাতে দুটো করে পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে কালোদেড়ে বিকট স্বরে অট্টহাস্য করে নেচে বলে উঠল, একবার নরকে ভর্তি হলে আমার শয়তানদাদা আর তোদের ছুটি দেবে না—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে নরকবাসের অভ্যাসটা করে নে রে!

—গেলুম, গেলুম,—আর নয়! বাবা রে, দম বন্ধ হয়ে এল!

তখন দরজা খুলে দিয়ে কালোদেড়ে গর্জন করে বললে, কেমন, এখন বুঝলি তো, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?

জাহাজের উপর থেকে কালোদেড়ের আস্ফালন শুনতে শুনতে কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, এমন সাংঘাতিক সহকারীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করা অতিশয় বিপজ্জনক। ভাবতে লাগলেন, এখন কোন উপায়ে এই নারকীর পাল্লা থেকে ভালোয় ভালোয় ছাড়ান পাওয়া যায়?

কালোদেড়ের বিদায়ী সেলাম

আরও কয়েকদিন যেতে না যেতেই কাপ্তেনের ভয় আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল। একদিন সমুদ্রে আবির্ভূত হল দুই-দুইখানা জাহাজ—তারা আসছে যথাক্রমে হাভানা ও বারমুডা থেকে!

হর্নিগোল্ডের জাহাজে অমনি উড়িয়ে দেওয়া হল হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা কালো 'জলি রোজার' পতাকা।

আগন্তুক দুই জাহাজই সেই অশুভ পতাকা দেখে শিউরে উঠে আত্মসমর্পণ করলে বিনা-বাক্যব্যয়ে।

হর্নিগোল্ড জাহাজ দুখানা নিঃশেষে লুণ্ঠন করলেন বটে, কিন্তু তাদের লোকজনদের অক্ষত দেহেই মুক্তি দিলেন। অকারণে তিনি রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে দারুণ ক্রোধে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গর্জন করে উঠল, ওদের সবাইকে ফেলে দাও সমুদ্রে, ওরা মাছেদের খোরাক হোক!

হর্নিগোল্ড দৃঢ়স্বরে বললেন, এ জাহাজের কাপ্তেন হচ্ছি আমি, তুমি হুকুম দেবার কেউ নও!

কালোদেড়ে বললে, মরা মানুষ কথা কয় না, সাক্ষ্য দিতে পারে না। আমি কাপ্তেন হলে কখনও ওদের ছেড়ে দিতুম না।

হর্নিগোল্ড বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই। তুমি যাতে কাপ্তেন হতে পারো, শীঘ্রই আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।

কালোদেড়ের মুখে হাসি ফুটল বটে, কিন্তু সে হাসি হচ্ছে দস্তুরমতো বিষাক্ত।

বাসনা পূর্ণ হল না বলে মনের দুঃখ ভুলবার জন্যে সে সদালুণ্ঠিত জাহাজ থেকে একটা মদের পিপে টেনে এনে নিজের দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বললে, চলে আয় সব তৃষ্ণার্তের দল! পেট ভরে মদ খা আর প্রাণ-ভরে ফুর্তি কর!

জাহাজের উপরে বইল যেন মদের ঢেউ! কালোদেড়ের টুপি থেকে লম্বমান জ্বলন্ত পলিতাগুলোও দেখাতে লাগল যেন অভিনব দেওয়ালির বাঁধা-রোশনাই! মদে চুমুকের পর চুমুক দিতে দিতে বলতে লাগল, জিনিস তোরা আমার বাহাদুরি? এ অঞ্চলের বারোটা বন্দরে আছে আমার এক ডজন বউ—আমি কি যে-সে লোক রে? দু-দিন সবুর করলেই দেখবি আমি হয়েছি নিজস্ব জাহাজের মালিক আর তার নাবিকরা পুরোপুরি আমারই তাঁবেদার!

তার সাধ পূর্ণ হল দিন কয়েক পরেই।

সমুদ্রে ঢেউ কেটে এগিয়ে আসছে একখানা বাণিজ্যপোত।

বোম্বেটে জাহাজের কৃষ্ণপতাকা দেখেও তার লোকজনরা দমল না, লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কালোদেড়েও তো তাই চায়—মারামারি, রক্তারক্তি, খুনোখুনি! কাপ্তেন হর্নিগোল্ডকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সায় দিতে হল।

বোম্বেটে-জাহাজ থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কামানের সারি এবং সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল বন্দুকগুলোও! মড়মড় করে ভেঙে পড়ল বাণিজ্যপোতের কয়েকখানা তক্তা এবং শোনা গেল আহতদের সকরুণ আর্তনাদ।

দুই জাহাজ পাশপাশি হতেই কান-ফাটানো ভৈরব গর্জন করে মহাকায় কালোদেড়ে মুর্তিমান অভিশাপের মতো লাফ দিয়ে পড়ল বাণিজ্যপোতের উপরে এবং শূন্যে বন-বন করে ঘুরতে লাগল তার রক্তলোভী, শাণিত ও বৃহৎ তরবারি! যারা বাধা দিতে এল তাদের কেউ প্রাণে বাঁচল না।

নিজের জাহাজে দাঁড়িয়ে কাপ্তেন হার্নিগোল্ড আশা করেছিলেন শত্রুবেষ্টিত কালোদেড়ে এ-যাত্রা আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। একথাও ভেবেছিলেন, নিজেই পিস্তল ছুড়ে পথের কাঁটা দূর করবেন–কিন্তু হায়, পিস্তলের গুলি অতদূরে পৌঁছোবে বলে মনে হল না।

ব্যর্থ হল হর্নিগোল্ডের আশা! শোনা গেল কালোদেড়ের ষণ্ড-কণ্ঠের সঙ্গে অন্যান্য বোম্বেটেদের হই-হুল্লোড়, জয়ধ্বনি! বাণিজ্যপোত অধিকৃত এবং তার লোক-লশকর হত আহত বা বন্দি!

বন্দি যাত্রীদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কালোদেড়ে নির্দয় হুকুম দিলে, ওদের সমুদ্রে ফেলে দে, ওরা মাছেদের উপবাস ভঙ্গ করুক!

যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগল গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে কালোদেড়ে বললে, এইবারে বন্দি নাবিকদের ব্যবস্থা কর! যারা আমাদের দলে যোগ দিতে না চাইবে, তারাও হবে মাছেদের খোরাক। আহত শত্রুগুলোকেও ওই সঙ্গে জলে ফেলে দে!

চিৎকার ও হাহাকার কোনও-কিছুতেই কান না পেতে বোম্বেটেরা কালোদেড়ের হুকুম তামিল করতে লাগল।

কালোদেড়ে চেঁচিয়ে হর্নিগোল্ডকে ডেকে বললে, শুনুন কাপ্তেন! এ জাহাজখানা এখন আমাদের!

হর্নিগোল্ড বললেন, আমাদের নয় বাপু, খালি তোমার! আজ থেকে তুমি হলে কপ্তেন টিচ!

কাপ্তেনের পদে উন্নীত হয়ে কালোদেড়ের ওষ্ঠাধরের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে সে সন্তুষ্ট হল না। এখানা হচ্ছে মাত্র 'স্লুপ (এক মাস্তুলের ছোটো জাহাজ), সে চায় বহু বড়ো বড়ো জাহাজের বহর চালনা করতে। হর্নিগোল্ডের জাহাজখানাও স্লুপ শ্রেণিভুক্ত।

কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর আবার নতুন শিকারের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা।

দুই দিনের মধ্যেই জুটল এক পরম লোভনীয় শিকার—একখানা মস্ত বড়ো ফরাসি জাহাজ!

চোখে-কনে ভালো করে কিছু দেখবার ও শোনবার আগেই বোম্বেটেদের জাহাজ দুখানা তিরবেগে তার দুই পাশে গিয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি বৃষ্টি করতে লাগল-—ফরাসি জাহাজখানার অবস্থা হল টলোমলো, দলে দলে মাল্লা মৃত বা জখম হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপরই দেখা গেল, এক রোমশ নরদানবের পিছনে পিছনে বোম্বেটেরা দলে দলে উঠছে আক্রান্ত জাহাজের পাটাতনের উপরে। তখনও যে-সব হতভাগ্য জীবন্ত ছিল তারাও জাহাজের পাটাতন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সশরীরে করলে পাতালপ্রবেশ!

কালোদেড়ে তৎক্ষণাৎ সেই নতুন ও প্রকাণ্ড জাহাজের নাম রাখলে—'প্রতিহিংসা! তারপর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে, ওহে নরকের খোকা হর্নিগোল্ড! তোমার ওই পুঁচকে খেলো জাহাজকে আমি এইখান থেকেই বিদায়ী সেলাম ঠুকছি! আমি নিজের পছন্দমাফিক জাহাজ পেয়েছি, তোমাকে এর মালপত্তরেরও ভাগ দেওয়া হবে না—হে হে হে হে, বুঝলে বাপু?

কাপ্তেন হর্নিগোল্ড কোনও জবাব দিলেন না, নিজের জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে চললেন নিউ প্রভিডেন্সের দিকে। বোম্বেটেগিরিতে তাঁর ঘৃণা ধরে গিয়েছে, তিনি এই নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবসায় ছেড়ে দেবেন।

পলাতক রণতরী

কালোদেড়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে দেরি লাগল না।

প্রথমেই তার কবলগত হল একখানা ইংরেজ জাহাজ-গ্রেট অ্যালেন। তারপরেই প্রমাণিত হল কালোদেড়ে যে-সে সাধারণ বোম্বেটে নয়! সে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম সওদাগরি জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে হাতিয়ার হাঁকড়ায় না এবং রণতরীর সামনে পড়লেই চটপট চম্পট দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে না।

'স্কারবরো' হচ্ছে ইংরেজদের বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ, তার পাটাতনে সাজানো সারে সারে ভারী ভারী কামান এবং তার নৌসৈন্যদের প্রত্যেকেই বন্দুকের অধিকারী।

হঠাৎ 'স্কারবরো' গিয়ে হাজির বোম্বেটের 'প্রতিহিংসা'র সামনে।

যুদ্ধজাহাজের নায়ক বরাবরই দেখে এসেছেন, রণতরীর সম্মুখীন হলেই বোম্বেটেরা তাড়াতাড়ি জাহাজের সব পাল খাটিয়ে দিয়ে বাঘের সামনে ভীরু হরিণের মতো পালাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি আগে থাকতেই নিজের জাহাজের সব পাল তুলে দিয়ে কামান দাগতে দাগতে বেগে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, 'প্রতিহিংসা' পালাবার কোনও চেষ্টাই করলে না!

মুখভরা হাসি নিয়ে নিজের জাহাজের পাটাতনের উপরে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালোদেড়ে, তার বেণিবদ্ধ শ্মশ্রু দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুই স্কন্ধের উপরে নিক্ষিপ্ত, তার টুপিতে সংলগ্ন প্রজ্বলিত পলিতাগুলো অগ্নিসর্পশিশুর মতো জোর-হাওয়ায় দিকে দিকে ছিটকে পড়ে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে আগুনের হলকা!

বোম্বেটে গোলন্দাজরাও কামানে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল।

কালোদেড়ে বললে, আর একটু সবুর করো, এখনও কামান দাগার সময় হয়নি। ওদের আরও কাছে আসতে দাও।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল, দুই জাহাজের মাঝখানকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। তারা প্রায় সামনাসামনি এসে পড়ল অবশেষে।

আচম্বিতে শূন্যে তরবারি চালনা করে কালোদেড়ে হুংকার দিয়ে হুকুম দিলে, সময় হয়েছে! কামান ছোড়ো!

‘প্রতিহিংসা'র সমস্ত কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

যুদ্ধজাহাজ স্কারবরো প্রথম আক্রমণেই বেধড়ক মার খেয়ে একেবারে কত হয়ে পড়ল! বিপুল বিস্ময়ে নৌসেনানায়ক কোনওরকমে নিজের রণতরী সামলে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের মানরক্ষা করতে না পারলেও রক্ষা করলেন পৈতৃক প্রাণগুলো!

বোম্বেটে-জাহাজের পিছনকার সব চেয়ে উঁচু পাটাতনের উপরে দেখা গেল—গগনভেদী চিৎকারে দিগবিদিক কাঁপিয়ে বিরাটবপু কালোদেড়ে ইংরেজ নৌসেনাদের উপরে গালাগালি ও অভিশাপ বর্ষণ করছে এবং মাথার উপরে বনবনিয়ে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে কখনও লাফ মারছে শূন্যপথে ও কখনও মেতে উঠছে তাণ্ডব নৃত্যে।

গৌরবের তুঙ্গশিখরে

ইংরেজ রণতরীকে হারিয়ে দেবার পর কালোদেড়ের খাতিরের সীমা রইল না। তার নাম শুনলেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে ভয়ে উড়ে যেতে চায় লোকের প্রাণপাখি! বিশেষত মালবাহী জাহাজি কাপ্তেনদের দূর্ভাবনার অন্ত নেই। যার দেখা পেলে যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে পিটটান দেয় ইংল্যান্ডরাজের সশস্ত্র ও সসজ্জ রণতরী, তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে নিরস্ত্র ও নির্বল সওদাগরি জাহাজ কতটুকু বাধা দিতে পারে?

না, বাধা দিতে পারেনি সত্যসত্যই। আর এই সত্য বোঝা গেল কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। কারণ উপরি-উপরি কয়েকখানা জাহাজ বন্দি করে কালোদেড়ে হয়ে দাঁড়াল রীতিমতো এক নৌবহরের অধিকারী। যেসব জাহাজ উল্লেখযোগ্য মনে হল না, সেগুলোকে সে বিনাবাক্যব্যয়ে ডুবিয়ে দিলে মহাসাগরের অতল পাতালে। সফল হল কালোদেড়ের বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা–তার তাবে এখন এসেছে সত্যসত্যই নৌবহর! কোনও সওদাগরি জাহাজ আজ অস্ত্রবলে বলীয়ান হলেও তার সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারবে না!

বন্দি বা ধৃত জাহাজের অসংখ্য লোক প্রাণ দিলে বোম্বেটেদের বন্দুক বা অন্যান্য অস্ত্রের মুখে। তুলনায় তাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কিন্তু যারা মরল না এবং যারা জখম হয়েও বেঁচে রইল তাদের পরিণাম হল মর্মবিদারক। কালোদেড়ের নিদারুণ নির্দেশে সাগরে ঝাঁপ খেতে বাধ্য হয়ে তাদের প্রত্যেকেই লাভ করলে সজ্ঞানে সলিলসমাধি! ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করেও বাঁচোয়া নেই, কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াও ব্যর্থ—কালোদেড়ের পাষাণ-হৃদয়ে কেউ দেখেনি দয়ামায়ার ছিটেফোটাও! তার মুখে শোনা যায় একই ধরনের উক্তি, ওদের জোর করে ছুড়ে ফেলে দে সমুদ্রে! হোক ওরা মাছেদের খোরাক—করুক ওরা হাঙরদের উদরপূরণ!

সে সময় অসীম সাগরের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কত হাজার মানুষের তীব্র ক্রন্দনধ্বনি শুনে চমকিত হয়ে উঠেছিল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, কোথাও তার কোনও হিসাব লেখা নেই!

তার দুষ্কর্মের সাক্ষ্য হতে পারে এমন কোনও মানুষ বা জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কালোদেড়ের কাছে ছিল দস্তুরমতো নির্বুদ্ধিতার কাজ।

কালোদেড়ের নতুন বউ

এক জাহাজের অধ্যক্ষকে বলে 'কাপ্তেন' এবং একাধিক জাহাজের অধ্যক্ষ 'কমোডোর' নামে পরিচিত। কালোদেড়ে গ্রহণ করলে উচ্চতর 'কমোডোর' উপাধি।

সে বললে, আহা, আজ আমার মা বেঁচে থাকলে পুত্রের গৌরবে হতেন গৌরবিনী! কিন্তু মা পরলোকে গেলেও ইহলোকে বসে এতটা গৌরব চুপচাপ ধাতস্থ্ করাও যায় না। অতএব সে নির্দেশ দিলে—উৎসব কর!

কালোদেড়ের বোম্বেটে-শাস্ত্রে উৎসবের অর্থ হচ্ছে নারকীয় কাণ্ড। সাগরের দিকে দিকে তার নৌবহরের গোলন্দাজরা সমস্ত কামান থেকে ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি করে দেখাতে লাগল বিরাট ও ভয়ংকর আগ্নেয় দৃশ্য!

দৈবগতিকে ও দুর্ভাগ্যক্রমে যারা তথাকথিত উৎসবের সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে এসে পড়ল, তারা যে কেউ ধনে-প্রাণে রক্ষা পেলে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। একে একে জলে ডুব মারলে চার-চারখানা লুণ্ঠিত জাহাজ।

তারপর নামে উৎসব শেষ হল বটে, কিন্তু জলপথে ছুটোছুটি করে জাহাজের পর জাহাজের উপরে হানা দিয়ে লুঠতরাজ, রক্তপাত ও নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড চলল অবিশ্রান্ত।

কালোদেড়ে ধনী যাত্রীদের কিন্তু প্রাণে মারত না, বন্দি করত। বন্দরে পৌঁছে আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠিয়ে প্রচুর টাকা মুক্তিমূল্য আদায় না করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত না। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে ধনী বন্দিদের জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুণ্ঠিত হয়ে উঠত গিয়ে কালোদেড়ের প্রশস্ত ভাণ্ডারে। এইভাবেও সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল।

ওই অঞ্চলে সমুদ্রের চারিদিকে আছে অসংখ্য ছোটো ছোটো দ্বীপ। সেইসব নামহীন দ্বীপে কোনও মানুষ বাস করে না, তাদের কোথায় কী আছে

তাও কেউ জানে না। প্রবাদ, এমনি কোনও অজানা দ্বীপে কালোদেড়ে এডওয়ার্ড টিচ তার বিপুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই গুপ্তধনের ঠিকানা কেউ আদায় করতে পারেনি।

কালোদেড়ে বলত, আমি আর শয়তান ছাড়া আমার গুপ্তধনের ঠিকানা আর কারুর জানা নেই।

তার বসনভূষণও এখন জাহির করে প্রচুর জাঁকজমক। তার হাতের প্রত্যেক আঙুলে শোভা পায় হিরা-পান্না বসানো আংটি। তার গলায় দোলে অনেকগুলো সোনার হারের লহর। তার বুকের বন্ধনীতে ঝোলে এখন নতুন যে তিনজোড়া পিস্তল, তাদের নলচেগুলো রুপো দিয়ে গড়া এবং তাদের কুঁদোগুলো মূল্যবান প্রস্তর দিয়ে অলংকৃত।

কালোদেড়ের এক প্রধান সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিল ইস্রায়েল হ্যান্ডস। একদিন তাকে ডেকে সে চুপিচুপি বললে, আমাদের দল কি অতিরিক্ত ভারী হয়ে পড়েনি?

—নিশ্চয়! এত লোককে লাভের অংশ দিতে দিতে আমাদের নিজেদের আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

—ঠিক ধরেছ হ্যান্ডস! তাহলে কৌশলে অংশীদারের দল হালকা করে ফেলা যাক!

বিভিন্ন ওজর দেখিয়ে দুইবারে দুইদল লোককে বিভিন্ন বিজন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বাছা বাছ লোক নিয়ে কালোদেড়ে দূর সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—একবারও ভেবে দেখলে না যে, এতদিন বিশ্বস্ত ভাবে যারা তার হুকুম মেনে এসেছে, জনহীন অজানা দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়ে তাদের দুরবস্থা উঠবে কতখানি চরমে! পরে সে কেবল এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে হালকা দল নিয়ে কাজ করলে পকেট বেশি ভারী হয় বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হয় গুরুতর সমস্যা!

বৎসরকালব্যাপী লুটতরাজ ও নরমেধযজ্ঞের পর আটলান্টিক মহাসাগর ও তার তীরবর্তী দেশগুলো যখন হয়ে উঠেছে প্রায় অরাজক ও হত্যা-হাহাকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং সবাই যখন দুঃখেশোকে-ক্রোধে একান্ত মরিয়া হয়ে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে একবাক্যে করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা, তখন সে একদিন অম্লানবদনে বললে, 'হ্যান্ডস, চলো নর্থ ক্যারোলিনার দিকে। দিন-রাত খালি জল আর জল দেখতে আমার আর ভালো লাগছে না!

—জল দেখা ছাড়া আর উপায় কী? স্থলে নামলেই তো আমাদের ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠের দোলনায় দুলতে হবে!

—কুছ পরোয়া নেই। আমরা ফাঁসির দোলনায় দুলব না,—রাজার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করব।

হ্যান্ডস সবিস্ময়ে বলে উঠল, বলেন কী, কর্তা? মার্জনা ভিক্ষা? কে আমাদের মার্জনা করবে?

—গভর্নর চার্লস ইডেন আমাদের হাসিমুখে মার্জনা করবেন।

—বলেন কী, হাসিমুখে?

—হ্যাঁ। গভর্নর ইডেন বড়ো ভালো লোক হে। যুক্তি মানেন। আমার যুক্তি কী জানো ভায়া? উৎকোচ! ঘুষখোরকে বশ করা মোটেই কঠিন নয়।

নর্থ ক্যারোলিনা হচ্ছে আমেরিকার আটলান্টিক সাগরতীরের একটি প্রদেশ। সেই প্রদেশের বাথ নগরে বাস করেন ইংল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি চার্লস ইডেন। কালোদেড়ের জাহাজ গিয়ে নোঙর ফেললে সেইখানেই।

মানুষ চিনতে ভুল করেনি কালোদেড়ে। গভর্নর ইডেন তার যুক্তি অকাট্য বলেই মেনে নিলেন। উচিতমতো উৎকোচ হজম করে তিনি কালোদেড়ের সমস্ত অপরাধ কেবল রাজার নামে ক্ষমাই করলেন না, উপরন্তু তার সঙ্গে জমে উঠল তার দস্তুরমতো দোস্তি—যাকে বলে দহরম-মহরম আর কী! সবাই অবাক! হতভম্ব!

বাথ শহরের একটি মেয়েকে দেখে কালোদেড়ের ভারী পছন্দ হল। তৎক্ষণাৎ সে করলে বিবাহের প্রস্তাব। কন্যাও নারাজ নয়। তখন সদাশয় গভর্নর বললেন, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই শুভকার্য সম্পন্ন করব।

এটি কালোদেড়ের ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বিবাহ তা ঠিক করে বলা যায় না। বিবাহে নিতবরের আসন গ্রহণ করলে গভর্নরের সেক্রেটারি টোরিয়াস নাইট! খুব ঘটা করে শুভকার্য সম্পন্ন হল বটে, তবে শহরের বনিয়াদি বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়েও উৎসবে যোগদান করলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে তাদের উপরেও নিলে একহাত! খুব জমকালো সাজপোশাক পরে সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় আর দারোয়ান ও খানসামাদের ডেকে বলে, তোমাদের মনিবকে গিয়ে খবর দাও, স্বয়ং শ্রীমতী টিচ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।

দারোয়ান ও খানসামাদের ইতস্তত করতে দেখলেই কালোদেড়ে তার রত্নখচিত ও রুপোয় বাঁধানো পিস্তলগুলো গুড়ম গুড়ম শব্দে ছুড়তে শুরু করে দেয়, দিকে দিকে বোঁ-বোঁ করে ছুটতে থাকে গরমগরম বুলেট এবং দারোয়ান ও খানসামারা হয় ভয়ে থরহরি কম্পমান! তারপরেই দরজা খুলতে ও গৃহস্বামীর আতিথ্যলাভ করতে বিলম্ব হয় না। কালোদেড়ে বারবার এইভাবে প্রমাণিত করলে সেই পুরাতন সত্যকথাটাই—জোর যার, মুল্লুক তার!

এখানে এসেও কিন্তু কালোদেড়ে নদী-পথে বোম্বেটেগিরি ছাড়ল না—বহু জাহাজ থেকে মালপত্তর ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হতে লাগল এবং বলা বাহুল্য যে, গোপনে তার লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন না স্বয়ং গভর্নরও!

জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ এলে গভর্নর ইডেন মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কাজে কিছুই করেন না। জাহাজের মালিকরা শেষটা এখানে হতাশ হয়ে পাশ্ববর্তী প্রদেশ ভার্জিনিয়ার গবর্নর স্পটসউডের কাছে গিয়ে নিজেদের জরুরি নালিশ জানালেন।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গভর্নর স্পট্‌সউড তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলেন যে কালোদেড়েকে গ্রেপ্তার বা বধ করতে পারবে, তাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের নৌবহরের দক্ষ যোদ্ধা লেফটেনান্‌ট রবার্ট মেনার্ডের উপরে হুকুম জারি হল, তিনি যেন অবিলম্বে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

গভর্নর ইডেনের সেক্রেটারি টোরিয়াসও কালোদেড়ের কাছ থেকে অল্পবিস্তর ঘুষ খেয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ নৌসেনাদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির কথা শুনেই সে প্রমাদ গুনে বোম্বেটের কাছে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিলে।

শয়তানি ফুর্তি

কিন্তু খবর পেয়েও কালোদেড়ে কিছুমাত্র দমল না বা ভীত হল না। নিজের দলের সবাইকে ডেকে অবহেলা ভরে বললে, ওহে, শুনেছ? টোরিয়াস চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, রাজার সৈন্যরা নাকি আমাদের শাস্তি দিতে আসছে। জাহান্নমে যাক রাজা! যারা আসতে চায় আসুক তারা! আমি তো জাকিয়ে বসে আছি নিজের আড্ডায়—সিংহের গহ্বরে ঢুকে ফেরুপাল কী করতে পারে?

তখন সন্ধ্যাকাল। হ্যান্ডস ও আরও দুইজন বোম্বেটেকে নিয়ে কালোদেড়ে নিজের কামরার ভিতরে প্রবেশ করে খুব খুশিমুখে বললে, আবার লড়াই হবে—কী মজা রে, কী মজা! ঢালো মদ, প্রাণ ভরে পান করো—আজ আমাদের আনন্দের দিন! দেখা যাক, কে কত বেশি মদ খেতে পারে!

একটা টেবিলের চারিদিক ঘিরে বসে চারজনে মিলে মদ্যপান শুরু করে দিলে। বাতির আলোতে খালি কালোদেড়ের গলার হার ও আঙুলের আংটিগুলো নয়, মুখের দাড়ি-গোঁফের ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে তার খুদে খুদে চোখদুটো জুলজুল করে জ্বলছিল—এবং জহির করছিল যেন কোনও নির্দয় কৌতুকের রহস্যময় ইশারা!

শয়তানের কাছে গিয়ে শয়তানি ছাড়া আর কী আশা করা যায়? বোধ করি সেই কারণেই প্রচুর মদ্যপান করেও জনৈক চালাক বোম্বেটে নেশায় ঝিমিয়ে পড়েনি—নিজের দৃষ্টিকে রেখেছিল অত্যন্ত জাগ্রত!

হঠাৎ সে দেখলে, কালোদেড়ের দুটো পিস্তলসুদ্ধ দুখানা হাত ধীরে ধীরে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল। সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওজর দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উদভ্রান্তের মতো।

অকস্মাৎ বিকট চিৎকার করে কালোদেড়ে এক ফুয়ে নিবিয়ে দিলে বাতিটা এবং অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়লে তার পিস্তলদুটো! তারপরেই আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও ভয়াবহ আর্তনাদ এবং একটা ভারী দেহপতনের শব্দ!

তাড়াতাড়ি আলো জেলে দেখা গেল, হ্যান্ডস দুই হাতে হাঁটু চেপে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং তার আহত হাঁটু থেকে হু হু করে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা!

একজন বোম্বেটে জিজ্ঞাসা করল, এর অর্থ কী?

হা হা করে হাসতে হাসতে কালোদেড়ে বললে, এর অর্থ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-একজনকে শাস্তি না দিলে সবাই ভুলে যাবে যে, এ জাহাজের আসল কর্তা কে? তারপর সে হেট হয়ে পড়ে বললে, চলে এসো হ্যান্ডস, চলে এসো—তোমার বিশেষ কিছু হয়নি বাপু! হাঁটুর উপরে একটা ছোটো ছ্যাঁদা বই তো নয়, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেই দু-দিনে সেরে যাবে—কী বলো হ্যান্ডস?

কিন্তু হ্যান্ডস কিছুই বললে না, পরদিন সকালেই তাকে দোলায় তুলে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কালোদেড়ের প্রভাতি ভোজ

ওদিকে তরুণ নৌসেনাপতি লেফটেনান্ট মেনার্ড প্রস্তুত হচ্ছিলেন যুদ্ধের জন্যে।

বোম্বেটেদের জাহাজ তখন বাহির-সমুদ্রে ছিল না, একটা খাড়ির (স্থলভাগে প্রবিষ্ট সমুদ্রের অপ্রশস্ত অংশ) ভিতরে গিয়ে নোঙর ফেলে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মেনার্ড বুঝলেন, তার অধীনে ‘নইম’ ও পাল’ নামে যে দুখানা প্রকাণ্ড রণতরী আছে, গভীর সাগরের আনাগোনার উপযোগী করে তারা গঠিত। একে তো খাড়ির জলপথ সংকীর্ণ, উপরন্তু চড়া পড়েছে তার যেখানে-সেখানে—বড়ো জাহাজ ঢুকলেই চড়ায় আটকে অচল ও অকেজো হয়ে পড়বে। কালোদেড়ের চালাকি বুঝে নিয়ে রণকুশল মেনার্ড তার ফাঁদে ধরা পড়তে রাজি হলেন না। তিনি ‘স্লুপ’ বা এক-মাস্তুলের দুখানা অপেক্ষাকৃত ছোটো ও হালকা জাহাজ নির্বাচন করলেন—তারা অগভীর জলেও চলা-ফেরা করতে পারবে অনায়াসেই। তার উপরে তাদের আরও হালকা করবার জন্যে ভারী ভারী কামানগুলোও সরিয়ে ফেলা হল। পরিবর্তে আমদানি করা হল গাদি গাদি বন্দুক—বড়ো কামানের অভাব পূরণ করবে তাদের সংখ্যাধিক্যই।

খবর নিয়ে জানা গেল, বোম্বেটেদের দলে পঁচিশজনের বেশি লোক নেই, কারণ কালোদেড়ে অতিরিক্ত লাভের লোভে দল অতিশয় হালকা করে ফেলেছে। মেনার্ড সঙ্গে নিলেন প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য। পঞ্চাশজন বন্দুকধারীর সামনে দাঁড়ালে পঁচিশজনকে পড়তে হবে যার-পর-নাই বেকায়দায়— এই ছিল তার ধ্রুবধারণা।

অপরাহ্ন কাল

খাঁড়ির বাঁকের মুখে আচম্বিতে দেখা গেল, দুখানা জাহাজের মাস্তুলের চূড়া।

বোম্বেটে-জাহাজের প্রহরী চেঁচিয়ে উঠে বললে, হুশিয়ার! দুখানা জাহাজ আসছে!

লাফ মেরে পাটাতনের উপরে উঠে কালোদেড়ে এক নজরে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে বললে, হুঁ, রাজার অভিযান! কিন্তু আমার এখানে আসার মজাটা ওদের ভালো করেই টের পাইয়ে দেব! বাছারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি। সে তখনও জানত না তার ফাদ আছে মেনার্ডের নখদর্পণে!

রাজার জাহাজ কাছে এসে পড়ল। কালোদেড়ে হাঁকলে, কে তোমরা?

মেনার্ড উত্তরে ধীর স্বরে বললেন, টের পাবে অবিলম্বেই।

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালনা করে বুঝলেন যে, বোম্বেটেদের জাহাজখানা আকারে তাদের চেয়ে বিশেষ বড়ো না হলেও ওর মধ্যে নিশ্চয়ই গাদাগাদি করা আছে কামানের পর কামান। ওখানাও এমন হালকা ভাবে তৈরি যে এই বিপদসংকুল অগভীর জলেও অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারে।

ভ্রু কুঞ্চিত করলেন মেনার্ড। ওদের পোতপার্শ্বের কামানগুলোর দারুণ অগ্নিবৃষ্টিতে মুষড়ে পড়লে চলবে না, তাঁকে একেবারে বোম্বেটে-জাহাজের পাশাপাশি গিয়ে পড়ে মুষলধারে গুলিবৃষ্টি করে প্রথমেই শত্রুদের রীতিমতো অভিভূত করে ফেলতে হবে। সৈন্য ও বন্দুকের সংখ্যাধিক্যের উপরেই তাঁর প্রধান ভরসা।

কিন্তু জলে এখন ভাটার টান, সময়টা এখানকার যুদ্ধের পক্ষে উপযোগী নয়। জোয়ারের জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এই স্থির করে মেনার্ড আজকের মতো নোঙর ফেলবার হুকুম দিলেন।

সেদিন রাতে বারে বারে মাতাল কালোদেড়ে পাটাতনের উপরে ছুটে এসেছিল এবং ভয়ানক গলাবাজি করে জানিয়েছিল--"ওরে রাজার চাকরগুলো, কাল প্রভাতি খানার সময় তোদের সকলকেই হতে হবে আমার শকের জলখাবার।

মেনার্ড একবার খেপে গিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, ওরে শুয়োর, শোন! তোর ওই নোংরা উকুনভরা কালো দাড়িতে পেরেক মেরে তোকে আমার জাহাজের গায়ে লটকে দেব-এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

রাজার জাহাজে নোঙর ফেলা হচ্ছে দেখে কালোদেড়ে আন্দাজে বুঝে নিলে যে, আপাতত বোম্বেটেরা নিরাপদ, কারণ সুচতুর শত্রুর ভাটার সময়ে অগভীর জলে জাহাজ চালিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। সকালে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হবে।

সে একজন বোম্বেটেকে কাছে ডেকে এনে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার চোখের কাছে নাড়তে নাড়তে ফিস-ফিস করে বললে, ওরে মুখ্যু, ভালো করে শুনে রাখ! যদি দেখিস আমরা হেরে যাচ্ছি আর রাজার সেপাইরা আমাদের জাহাজের উপরে উঠে পড়েছে, তখনই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আমাদের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিবি! তারপর কী মজা হবে জানিস তো? দড়াম করে এক দুনিয়া-কাঁপানো ধুন্ধুমারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই মিলে সরাসরি গিয়ে নরক গুলজার করে তুলব। কী রে, পারবি তো?

এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনে বোম্বেটে-বাবাজির আত্মা শুকিয়ে যাবার উপক্রম! মুখরক্ষা করবার জন্যে তবু সে কোনওরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কালোদেড়ে বললে, যা তবে! বারুদখানায় গিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক! কাল এসপার কি ওসপার!

বোম্বেটে দুরু-দুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান করল।

চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্না ফুটল। মদে শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে কালোদেড়ে নিজের কামরার দিকে ছুটল এবং যেতে যেতে আর-একবার গর্জিত কণ্ঠে জানিয়ে দিয়ে গেল যে—ওরে রাজার দাসানুদাসের দল! শুনে রাখ তোরা রাত পোয়ালেই আমি তোদের হাড় খাব, মাস খাব আর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব—হা হা হা হা হা হা!

যুদ্ধজাহাজের দুর্দশা

উষার সিঁদুরমাখা আকাশ ঢেকে রাখতে পারলে না পাতলা কুয়াশার পর্দা। খাঁড়ির বুকে এসেছে জোর জোয়ার। জলে জেগেছে কলকল করে কলহাস্য।

রাজার জাহাজ-জোড়া এগিয়ে আসছে ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মেনার্ড নিজের লোকজনদের ভরসা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলছিলেন, কোনও ভয় নেই—আগে চল, আগে চল ভাই! বোম্বেটেরা বড়ো জোরে একবার কি দুইবার কামান ছোড়বার ফুরসত পাবে, তার পরেই আমরা ছুটে গিয়ে গুড়মুড় করে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেখব তখন পঁচিশটা বন্দুক কেমন করে সামলায় পঞ্চাশটা বন্দুকের ঠেলা! আগে চল!

এতক্ষণ পরে কালোদেড়ের মন দোলায়মান হল সন্দেহদোলায়। কুয়াশার ফিনফিনে পর্দা ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, রাজার জাহাজ দুখানা এগিয়ে আসছে।--ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঘনায়মান বিপদ! একেবারে শেষ-মুহূর্তেই সে আন্দাজ করতে পারলে, শত্রুরা দলে তার চেয়ে দুগুণ বেশি ভারী! সে স্থির করলে, জাহাজ নিয়ে খাড়ির ভিতরে আরও দুর্গম অংশে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সে চেচিয়ে হুকুম দিলে—নোঙর তোলো, নোঙর তোলো!

কিন্তু সময় নেই—সময় নেই! শত্রু যে শিয়রে! পালাবার পথ যে বন্ধ!

কালোদেড়েকামান দেগে পথের বাধা দূর করতে চাইলে—হ্যাঁ, এই হচ্ছে বাঁচবার একমাত্র উপায়।

প্রচণ্ড চিৎকারে শোনা গেল তার চরম আদেশ—কামান ছোড়ো, একসঙ্গে সব কামান ছোড়ো। আগুনের ঝড়ে উড়িয়ে দাও সামনের সব প্রতিবন্ধক!

কর্ণভেদী বজ্রনাদ ধ্বনিত করে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস কেটে তীব্র বেগে ছুটে গেল সেই সর্বনাশা অগ্নিপিণ্ডগুলো—কিন্তু হায় রে হয়, তারা রাজার জাহাজকে স্পর্শ করবার আগেই জলের ভিতরে ঝুপ ঝুপ করে পড়ে তলিয়ে গেল!

মেনার্ড বিপুল পুলকে বলে উঠলেন, গোলাগুলো গিয়েছে জলের জঠরে—আমরা অক্ষত। এইবারে গর্জন করুক আমাদের বন্দুকগুলো—তারা কেউ ব্যর্থ হবে না?

গুডুম, গুডুম, গুম! গুডুম, গুড়ম, গুম!

রাগে পাগলের মতো হয়ে কালোদেড়ে দেখলে, তার দুজন গোলন্দাজ হাত-পা ছড়িয়ে মৃত্যু-ঘুমে এলিয়ে পড়ল এবং তার জাহাজখানাও চড়ায় আটকে অচল হল! কণ্ঠে তার ফুটতে লাগল প্যাঁচার মতো কর্কশ চিৎকার।

আবার গুডুম, গুড়ম, গুম! ওরে বাবা, গুলির ঝাঁক বনবনিয়ে ছুটছে কানের পাশ দিয়ে। কালোদেড়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল!

কিন্তু এ কী দৈব-বিড়ম্বনা! হঠাৎ স্রোতের টানে পড়ে রাজার জাহাজ দুখানার মুখ গেল ঘুরে এবং কালোদেড়েও ছাড়লে না এই দুর্লভ সুযোগ।

তৎক্ষণাৎ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বজ্র-কণ্ঠে সে গজে উঠল—আবার কামান ছোড়ো, আবার কামান ছোড়ো!

আবার জাগল কামানগুলোর ভৈরব হুংকার! এবারে তারা ব্যর্থ হল না এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়লে না বোম্বেটেদের বন্দুকও!

তারপর মনে হল সেখানে সৃষ্ট হয়েছে অভাবিত এক শব্দময় মহানরক! ফটাফট ফেটে গেল রাজার জাহাজ দুখানার নানা জায়গা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের মাস্তুল, মৃত্যুন্মুখ যোদ্ধাদের চিৎকার ছুটে গেল দিকে দিকে! নৌসেনাদের উনত্রিশজনের মৃতদেহ পড়ে রইল পাটাতনের যেখানেসেখানে।

বিকট উল্লাসে চেঁচিয়ে কালোদেড়ে বলে উঠল, এবার ওদের পেয়েছি হাতের মুঠোর মধ্যে। আবার ছোড়ো কামান-বন্দুক! ডুবিয়ে দাও জাহাজ দুখানা মড়াগুলোর সঙ্গে জীবন্তরা মেটাক মাছেদের ক্ষুধা!

লেফটেনান্ট মেনার্ড দিকে দিকে ছুটোছুটি করে নিজের দলের হতভম্ব লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। এবং ইতিমধ্যে দুইপক্ষের জাহাজ পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ল।

মেনার্ড ভাবলেন একবার যদি সদলবলে ওদের জাহাজে লাফিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আর কোনও ভাবনাই থাকে না! কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝে ফেললেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়!

দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে দেখে কালোদেড়ে নতুন হুকুম জারি করলে—নিয়ে এসো হাত-বোমা! সবাই হাত-বোমা ছোড়ো!

নতুন বিপদের সম্ভানা দেখে মেনার্ড নিজেদের সৈন্যদের ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলায় গিয়ে গাঢাকা দাও!

দুই পক্ষের জাহাজে জাহাজে লেগে গেল বিষম ঠোকাঠুকি—শোনা যেতে লাগল মড়মড়িয়ে কাঠভাঙার শব্দ!

দুম, দুম, দুম! বোমার পর বোমা ফাটার বেজায় আওয়াজ, ধুমধড়াক্কা! রাজার জাহাজ দুখানার পাটাতন ভগ্ন-চুর্ণ, ধূমায়িত, অগ্ন্যুৎপাতে ভয়াবহ চোখের সামনে যেন মারাত্মক আতশবাজির খেলা দেখতে দেখতে বিকট উল্লাসে কালোদেড়ে অট্টহাস্য করতে লাগল।

কালোদেড়ে কালগ্রাসে

কালোদেড়ের রোমশ, মদমত্ত ও অমানুষিক দেহ তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে মেনার্ডের 'রেঞ্জার' নামক জাহাজের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলে অন্যান্য বোম্বেটেরাও!

হুহুংকারে শোনা গেল তার হিংস্র কণ্ঠে—সিংহার! সংহার! হা রে রে রে! শুরু হোক প্রলয়কাণ্ড!

আচম্বিতে পাটাতনের দরজা ঠেলে কৃপাণ তুলে মেনার্ড ও তার সৈন্যদের আবির্ভাব! ব্যাপারটা এতটা অভাবিত যে বোম্বেটেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত! কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেদের হতভম্ব ভাব সামলে নিয়ে তারা সবেগে আক্রমণ করলে—লেগে গেল হাতাহাতি লড়াই! খড়্গে খড়্গে হত্যা-ঝঞ্ঝনা! আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্রুম-ধ্রাম! যোদ্ধাদের গর্বিত বাক্যাড়ম্বর!

তারপরেই অন্য জাহাজ থেকেও মেনার্ডের আরও সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগদান করে বোম্বেটেদের অবস্থা করে তুললে শোচনীয়। জাহাজের নীচে জলস্রোত, জাহাজের উপরে রক্তস্রোত!

কালোদেড়ে তখনও ভয় পেলে না—তার একহাতে তরবারি, আর-একহাতে পিস্তল! মৃতদের পায়ে মাড়িয়ে এবং জীবিতদের ঠেলে সে যেন প্রলয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে মেনার্ডের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহগর্জনে বলে উঠল, আরে রে ঘৃণ্য জীব! নরকে যাবার সময় তোকেও আমি ছেড়ে যাব না বৃহৎ তার রক্তস্নাত কৃপাণ, তাকে ঠেকাতে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেনার্ডের তরবারি! আর রক্ষা নেই! উন্মত্তের মতো অট্টহাসি হেসে ও দীপ্ত নেত্রে অগ্নিবর্ষণ করে কালোদেড়ের ভীমবাহু আবার তুললে তার সাংঘাতিক অস্ত্র—কিন্তু পরমুহূর্তে একজন নৌসৈন্য ছুটে এসে বন্দুকের কুঁদে দিয়ে তার মাথার উপরে করলে প্রচণ্ড আঘাত!

পাটাতনের উপরে ধড়াম করে আছড়ে পড়ল বোম্বেটে সর্দার। মুহুর্তের মধ্যে চারিদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরলে নৌসৈন্যের দল এবং তরবারি, ছোরা ও বন্দুকের কুদো দিয়ে সবাই অশ্রান্ত ও নিষ্ঠুর ভাবে বিরাট দেহের উপরে করতে লাগল প্রবল আঘাতের পর আঘাত!

কিন্তু কী অসাধারণ তার সহ্যক্ষমতা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, সেইসব মারাত্মক আঘাতের পরেও সে কাবু হতে চাইলে না, উলটে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার শেষ পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করলে মেনার্ডের দিকে। ওই পর্যন্ত! তার জীবনীশক্তি তখন একেবারে ফুরিয়ে এসেছে, পিস্তল ছোড়বার আগেই সে আবার ধপাস করে পড়ে গেল এবং তার সর্বাঙ্গে জাগল অন্তিম শিহরন সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে সে প্রাণত্যাগ করলে।

তার কালো দাড়ি তখন রক্তরাঙা, সর্বাঙ্গও রক্তভীষণ। গুনে দেখা গেল, তার দেহের পঁচিশ জায়গায় রয়েছে পঁচিশটা প্রাণনাশক আঘাতের চিহ্ন!

যুবক যোদ্ধা মেনার্ড নিহত বোম্বেটে-সর্দারের প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ময়প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে। তাকে অভিভূত করে ফেলেছে তার বন্য সাহস!

কিন্তু অভিভূত হলেও মেনার্ড নিজের প্রতিজ্ঞা ভুললেন না। একজন সৈনিককে ডেকে বললেন, বোম্বেটে-সর্দারের মুণ্ডটা কেটে জাহাজের গায়ে ঝুলিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য, সর্দারের পতনের পর হতাশ হয়ে আত্মসমপণ করেছিল বাকি বোম্বেটেরাও।

এই ভয়ঙ্কর বোম্বেটে দলকে দমন করে লেফটেনান্ট মেনার্ড ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

রক্ত-বাদল ঝরে

বোম্বেটে না বর্বর

বোম্বেটে কাকে বলে সবাই তা জানে। বোম্বেটে বা জলদস্যু পৃথিবীর সব দেশেই সব সময়ে ছিল। এখনও আছে।

তবে বোম্বেটে-জীবনের গৌরবময় যুগ আর নেই। আগেকার বোম্বেটেদের ক্ষমতা ছিল অবাধ ও খ্যাতি ছিল আশ্চর্য, এখনকার বোম্বেটেরা তাদের কাছে হচ্ছে তিমিমাছের কাছে পুঁটিমাছের মতো।

উড়োজাহাজ, বাষ্পীয় পোত ও বেতার টেলিগ্রাফের মহিমায় আজ আর কোনও বোম্বেটেই বেশি মাথা তুলতে বা বেশিদিন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। চীনে বোম্বেটেরা আজও মাঝে মাঝে মাথা চাগাড় দেয় বটে, কিন্তু তাদের জারিজুরি ওই চীনা সমুদ্রের ভিতরেই। চীনদেশের ভিতরকার অবস্থা ভাল নয়, রাজ্যবিপ্লব নিয়েই সেখানকার গভর্নমেন্ট ব্যতিব্যস্ত, সেইজন্যেই চীনে বোম্বেটেরা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবার সুযোগ পায়।

অন্যান্য দেশের আধুনিক বোম্বেটেরা উল্লেখযোগ্য জীব নয়। তারা আছে—এইমাত্র। বাংলাদেশে বোম্বেটে কথাটি বেশিদিনের নয়। বার ভূঁইয়ার সময়ে বাংলাদেশে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিষম উপদ্রব হয়েছিল। তখনকার রডা, গঞ্জালিস ও কার্ভালো প্রভৃতি জলদস্যুর নাম বাঙালি এখনও ভুলতে পারেনি, কারণ বর্গির অত্যাচার ও মগের অত্যাচারের মতো পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারও ছিল তখনকার বাংলাদেশের নিত্য-নৈমিত্তিক বিভীষিকা। ওই সময়েই বোম্বেটে কথাটি বাংলাদেশে চলতে শুরু হয়। ইংরেজি Bombardier-এর বাংলা হচ্ছে ‘গোলন্দাজ সৈন্য’। পর্তুগিজ জলদস্যুরা গোলন্দাজিতে অর্থাৎ কামান-বন্দুকের ব্যবহারে দক্ষ ছিল। তাই বোধহয়, ওই ইংরেজি কথাটা থেকে বাংলা 'বোম্বেটিয়া’ বা বোম্বেটে’ কথাটির সৃষ্টি হয়, আর সাধারণভাবে জলদস্যুদেরই প্রতি ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘বোম্বেটে’ কথাটি খাঁটি বাংলা কথা না হলেও খাঁটি বাঙালি বোম্বেটের অভাব বাংলাদেশে ছিল না। তবে এখানে তো সমুদ্রতীরবর্তী নগর বেশি নেই, কাজেই বোম্বেটেদের ছোট ছোট নৌকা করে নদ-নদীর ভিতরে এসেই ব্যবসা চালাতে হত। বড় বড় জাহাজে চড়ে পৃথিবীর নামজাদা বোম্বেটেদের মতো সমুদ্রের উপর বড়রকমের ডাকাতি করার সুযোগ তাদের বেশি ছিল না।

সেকেলে বাংলার জল-ডাকাতদের সাধারণ নিয়ম ছিল এই রকম: কোনও যাত্রীনৌকো দেখলেই তারা নিজেদের নৌকো নিয়ে তার কাছে গিয়ে বলত, “আমাদের আগুন নিবে গেছে। একটু আগুন দেবে ভায়া?” যাত্রী নৌকোর লোকেরা কোনরকম সন্দেহ না করে আগুন দেবার জন্যে বোম্বেটে নৌকোর পাশে গিয়ে হাজির হত এবং অমনি সেই সুযোগে বোম্বেটেরা যাত্রী নৌকোর ভিতরে লাফিয়ে পড়ে সর্বনাশের সৃষ্টি করত। বারে বারে এমনি ঠকে শেষটা অচেনা নৌকো আগুন চাইলেই তারা তাড়াতাড়ি আরও তফাতে সরে পড়ে পলায়ন করত।

বাংলাদেশে জল-ডাকাতরা প্রায়ই ছিপ নৌকো ব্যবহার করত। এখানকার ডাঙার ডাকাতরা তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে ব্যবহার করত ‘রণপা’। রণপা হচ্ছে দুটো লম্বা বাঁশের ডাণ্ডা—মানুষের মাথার চেয়ে অনেক উঁচু। সেই ডাণ্ডার মাঝখানে পা রাখবার জায়গা থাকে। (ইউরোপেরও অনেক দেশের চাষীরা শস্যক্ষেতে চলাফেরা করবার সময়ে এমনই রণপা ব্যবহার করে থাকে) কিন্তু বাংলার ডাঙার ডাকাতরাও জলপথে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে বোম্বেটেদেরই মতো ছিপ ব্যবহার করত।

আইনের চোখে অপরাধী হলেও সামাজিক হিসাবে, আগেকার বোম্বেটেরা বোধহয় সাধারণ খুনি বা ডাকাতের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব ছিল। কারণ, দেখা যায়, আগেকার এমন কয়েকজন লোক নৌ-যোদ্ধারূপে বিখ্যাত হয়ে প্রভূত যশ ও রাজসম্মান অর্জন করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছেন, যাদের বোম্বেটে বললে খুব ভুল করা হয় না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মধ্য আমেরিকা

যেমন ভাস্কো ডা গামা। পর্তুগালের এই নামজাদা যোদ্ধা-নাবিক পর্তুগিজ অধিকৃত ভারতবর্ষের বড়লাটরূপে কোচিতে প্রাণত্যাগ করেন (১৫২৪)। কিন্তু আফ্রিকার স্থানে স্থানে ও ভারতের কলিকটে তিনি যেসব কাজ করে গেছেন, তা বোম্বেটের পক্ষেই সাজে। পর্তুগালের আর এক নাবিক-নেতা ফার্ণান ম্যাগেল্যানও স্বদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রতি লাভ করেছেন, কিন্তু তিনি সাধারণ ইতর বোম্বেটের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন না।

ইংলন্ডকে স্পেনের ‘আর্মাডা’র কবল থেকে বাঁচিয়ে এবং অনেক নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক আজ স্বদেশভক্ত বীর বলে সুপরিচিত। সে হিসাবে সত্যসত্যই তিনি এই সম্মানের অধিকারী। কিন্তু জলদস্যুরা যে কাজ করলে নিন্দিত হয়,তাঁর অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যেই তা লক্ষ্য করা যায়। ড্রেক একালে জন্মালে, পৃথিবী বোধহয় তাকে ক্ষমা করত না। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে লুটতরাজ করেছেন, হাজার হাজার অসহায় মানুষকে হত্যা করেছেন, বড় বড় শহরকে আগুনের মুখে সমর্পণ করেছেন। সে দেশের লোকের কাছে তিনি নিশ্চয়ই বীর নামে পরিচিত হন নাই। যুদ্ধের নামগন্ধনেই, নগর লুণ্ঠনও শেষ হয়ে গেছে, তবু হাইতি দ্বীপের রাজধানী স্যান্টো ডোমিঙ্গো শহরের নিরীহ বাসিন্দাদের উপর ড্রেক অনবরত গুলিগোলা বৃষ্টি করেছেন। নগরের চতুর্দিকে যখন ভীষণ অগ্নির তাণ্ডবলীলা,নিরপরাধ নর-নারী ও শিশুর আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ এবং ড্রেকের সৈন্যরা যখন ক্রমাগত গুলিগোলা বৃষ্টি করে একেবারে নেতিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে, তখনও লক্ষাধিক মুদ্রা ঘুষ না পাওয়া পর্যন্ত ইংলন্ডের এই মহাবীর তুষ্ট হতে পারেননি।

পনের, ষোল ও সতের শতাব্দীতে ইংলন্ডবাসীরা নৌ-যোদ্ধা ও বোম্বেটেকে যে প্রায় অভিন্ন বলে মনে করত, তার অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তখন সমুদ্রে ও সাগর তীরবর্তী স্থানে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে, ইংরেজরা অধিকাংশ সময়েই সাধারণ বোম্বেটেদের সাহায্য গ্রহণ করত। ইংলন্ডের রাজা, রানী ও শাসনকর্তারা পর্যন্ত বেতনভুক্ত নিয়মিত নীে-সৈন্যদের সঙ্গে বোম্বেটেদের পালন করতে লজ্জিত হতেন না—যেমন হতেন না বাংলা দেশের বার ভূঁইয়ারাও। রাজার সাহায্য পেয়ে বোম্বেটেদেরও বুক দশহাত হয়ে উঠত, তারা রাজশত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অজুহাতে নিরীহ প্রজাদের ধন-প্রাণ নির্ভয়ে লুণ্ঠন করত।

এই শ্রেণীর বোম্বেটেদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে হেনরি মর্গান। এই ভীষণ বোম্বেটেকে ইংলন্ডের রাজসরকার টাকা, জাহাজ ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করেন। তার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে কারুর পক্ষে ধন-প্রাণ বজায় রেখে বাস করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। পানামার মতো শহরেও হেনরি মর্গ্যান হানা দিতে ভয় পায় নি, তার কবলগত হয়ে পানামার অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায় এবং যথাসর্বস্ব হারিয়েও এখানকার কত হাজার বাসিন্দা যে মৃত্যুমুখে পড়তে বাধ্য হয়, তার কোনও হিসাব নেই। ওই ওঁচা বোম্বেটেকে জলদস্যুরা পর্যন্ত ঘৃণা করত। কারণ সে কাক হয়েও কাকের মাংস খেত,—অর্থাৎ মর্গান কেবল পরিচিত নির্দোষ ব্যক্তিরই ধন-প্রাণ কেড়ে নিত না, নিজের দলের লোকদেরও টাকা দুহাতে চুরি করত। জলপথে ও স্থলপথে অসংখ্য অত্যাচার, নরহত্যা, লুণ্ঠন ও পাপকাজ এবং বোম্বেটেদেরও তহবিল তছরুপ করে, শেষটা সে সকলকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ একদিন লুকিয়ে সরে পড়ে। তখন ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ধর্মভাব হঠাৎ জেগে উঠল। তার হুকুমে মর্গানকে ধরে দেশে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বোম্বেটে সর্দারকে স্বচক্ষে দেখে রাজার মন এত খুশি হয়ে উঠল যে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, স্যার উপাধি ও কর্ণেল পদ দিয়ে তিনি তাকে আবার জামাইকা দ্বীপের ছোটলাট করে পাঠালেন।

রেমব্রাণ্ডের মতো বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজনমান্য চিত্রকর আঁকলেন কর্ণেল স্যার হেনরি মগ্যানের ছবি এবং যার মরা উচিত ছিল ফাঁসিকাঠে, ছোটলাটের উঁচু, পুরু ও নরম গদিতে বসে সে সাধু অসাধুর শাসনভার—অর্থাৎ মুণ্ডপাতের ভার পেয়ে চৌদ্দ বৎসর সুখে সম্মানে কাটিয়ে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে পরম নিশ্চিন্তভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে! পাপের এমন জয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না! এমনকি আজও দেখি, অনেক নামজাদা

ইংরেজ লিখিয়ে এই বোম্বেটের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্যে প্রাণপণে ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য!

অথচ ওই সময়কার ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা কানহোজি আংগ্রেকে জলদস্যু রূপে বর্ণনা করতে লজ্জিত হন নি। ভারতে যখন ঔরংজেবের রাজত্ব, মারাঠী নৌ-বীর কানহোজি আংগ্রের নামে তখন আরবসাগরগামী সমস্ত জাহাজ ভয়ে থরহরি কম্পমান হত। স্থলপথে ছত্রপতি শিবাজির মতন জলপথে কানহোজি আংগ্রেও ছিলেন সমান অজেয়। ইংলন্ডে জন্মালে তিনি ড্রেক বা নেলসনেরই মতো পৃথিবীজোড়া অমর নাম অর্জন করবার সুযোগ পেতেন। মোগল, ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজদের কোনও জাহাজই তার কবল থেকে সহজে নিস্তার পেত না। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা একসঙ্গে অনেক যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বার বার তাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু প্রতিবারই একাকী লড়েও জলযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন মহাবীর কানহোজি আংগ্রেই! অথচ তখন ইউরোপের পূর্বোক্ত জাতিরা স্থলযুদ্ধের চেয়ে জলযুদ্ধেই বেশি বিখ্যাত ছিলেন। বার বার পরাজিত শত্রুদের কলমে ‘বোম্বেটে’ বলে নিন্দিত এই অসাধারণ ভারতীয় নৌ-বীরের বীরত্বকাহিনী যে আজও এখানে ঘরে ঘরে পরিচিত হয়নি, আমাদের ঐতিহাসিকদের পক্ষে এটা অল্প কলঙ্কের কথা নয়। বাংলা ভাষায় প্রায় তিন যুগ আগে পুরাতন ‘ভারতী’তে একবার কানহোজি আংগ্রে সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ দেখেছিলুম, তারপর আর কারুর তাকে মনে পড়েনি!

সাধারণ হত্যা বা দস্যুতার মধ্যে লুকোচুরি ও কাপুরুষতা আছে যতটা, বোম্বেটের কাজে যে ততটা নেই, সত্যের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করা চলে অনায়াসেই। যে যুগে বোম্বেটেদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি, তখন সমুদ্রযাত্রার সময়ে প্রত্যেক জাহাজের আরোহীরাই তাদের দেখা পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতেন ও সাবধান হয়ে থাকতেন এবং বোম্বেটেদের ভয়ে অধিকাংশ সওদাগরী জাহাজেও কামান-বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র রাখা হত। অনন্ত সমুদ্র,—সাধারণ

খুনে বা ডাকাতের মতো বোম্বেটেরা অতর্কিতে হঠাৎ এসে আক্রমণ করতে পারত না, তাদের অনেক দূর থেকেই স্পষ্ট দেখা যেত এবং আক্রান্তরাও আত্মরক্ষা করবার সুযোগ পেত যথেষ্ট। কিন্তু তবু যে তারা বাঁচতে পারত না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে বোম্বেটেদের সাহস ও বীরত্ব। তবে জলদস্যুদের এত নিন্দা কেন? তাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে, জোর যার মুল্লুক তার। এ মূলমন্ত্র সমাজের শান্তিরক্ষার পক্ষে অচল। তার উপরে সেকালকার বোম্বেটেদের নিষ্ঠুরতা ও হিংসুকতা ছিল অসম্ভব—দয়ামায়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা মানত না। অধিকাংশ সময়েই তারা কোনও জাহাজ দখল ও লুট করে সমস্ত আরোহীকেই নির্বিচারে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করত। প্রাণে মারবার আগে অনেক লোককে তারা অমানুষিক যন্ত্রণা দিতেও ছাড়ত না। তারা নরপশু ছিল বলেই তাদের সমস্ত সাহস ও বীরত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো। যে বীরত্বে ক্ষমা নেই, দয়া নেই, মনুষ্যত্ব নেই, তা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ফরাসি জলদস্যু লোলোনজের পাশবিক বীরত্বের কাহিনী আমরা পরে বিবৃত করব। ব্রেজিলিয়ানো নামে আর এক বোম্বেটের গল্পও আমরা পরে বলব, যা পড়তে পড়তে পাঠককে শিউরে উঠতে হবে। এ শ্রেণীর লোকের সাহস ও বীরত্ব না থাকলেই ভাল ছিল।

জলদস্যু হচ্ছে প্রাচীন যুগেরই জীব। গ্রিকদের সময়েও জলদস্যুদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সে সময়ে সমুদ্রে বেরিয়ে এক জাহাজ যদি আর এক জাহাজকে দেখতে পেত, তাহলে সর্বাগ্রে প্রশ্ন করত, “তোমরা বোম্বেটে, না সওদাগর?” রোমানদের সময়েও গ্রিক বোম্বেটেরা দলে এত ভারি ছিল যে, ভূমধ্যসাগর দিয়ে সাধারণ জাহাজ প্রায় চলাফেরা করতে পারত না বললেই চলে।

ভূমধ্যসাগরে বোম্বেটে জাহাজের সংখ্যা তখন এক হাজারের কম ছিল না। রোমানরা শেষটা বাধ্য হয়ে বিপুল এক রণতরীর বাহিনী পাঠিয়ে এই দস্যুতা দমন করেছিল। কিন্তু এর পরেও অনেকবার জলদস্যুদের অত্যাচারে রোমকে

যারপরনাই কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। সেকালকার ইংলন্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও স্পেনের সমুদ্রতীরবতী নগরগুলি নানাদেশি বোম্বেটেদের অত্যাচারে যখন তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভে চীনারা সিংহলদেশের উপরে কি বিষম ডাকাতি করেছিল এইবারে সেই কথাই বলি। চেংহো নামে এক চীনা খোজা একবার জাহাজে চড়ে সিংহলদেশে গিয়েছিল। সেখানে বুদ্ধদেবের পবিত্র দাঁত আছে শুনে সে আব্দার ধরে বসল, তাকে ওই দাঁত উপহার দিতে হবে। বলাবাহুল্য, সিংহলের তখনকার রাজা অলগাক্কোনারা (?) তার সে অন্যায় আব্দার গ্রাহ্য করলেন না। চেং হো সেবারের মতো মুখ চুন করে খালি হাতেই চীনদেশে ফিরে গেল।

কিন্তু ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে বাষট্টিখানা জাহাজ নিয়ে সে আবার সিংহলদেশে আবির্ভূত হল। সিংহলের রাজার সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের তুমুল লড়াই লেগে গেল। সেই ফাঁকে চেং হো একদল সৈন্য নিয়ে সিংহলি সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ রাজধানীতে এসে কৌশলে নগর দখল করলে এবং রাজা ও রাজপরিবারের ছেলেমেয়ে ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদের বন্দি করে সটান আবার চীনদেশে গিয়ে হাজির হল। পরে রাজ্যচ্যুত রাজাকে চীনারা আবার সিংহলদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর, কিছুকাল পর্যন্ত সিংহল দেশকে চীনসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে কর পাঠাতে হত। এই বোম্বেটেগিরির পরে, ভারতসাগরে চীনাদের প্রভাব দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল।

চীনদেশেরও সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলি নিরাপদ ছিল না—সেসব জায়গায় জাপানি বোম্বেটেরা সকলকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর ইংরেজ ও ওলন্দাজ বোম্বেটেদের দৌরাত্ম্যেও চীনাদের বড় কম নাকাল হতে হয়নি।

আগেই বলেছি, ইংরেজরাও সেকালে বোম্বেটের ব্যবসায়ে যথেষ্ট বদনাম কিনেছিল। রানী এলিজাবেথ অনেক ইংরেজ বোম্বেটেকে নিজের নৌ-সেনাদলে

ভর্তি করে নিয়েছিলেন। সে সময়ে জন স্মিথ নামে এক মহা ধড়িবাজ বোম্বেটের জ্বালায় ইংরেজরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং তাকে বন্দি করে ফাঁসিকাঠে লটকে দেবার জন্যে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারেনি।

এমন যে শয়তান, তারও মনে ছিল প্রচুর দেশভক্তি। হঠাৎ সে একদিন নিজেই কর্তৃপক্ষের কাছে এসে হাজির—ধরা দিলে মুক্তি নেই জেনেও। সকলেই অবাক হয়ে গেল! কিন্তু বোম্বেটে জন স্মিথ বললে, দেশের বিপদ দেখেই আমি ধরা দিচ্ছি। সবাই প্রস্তুত হও! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, ইংলন্ড ধ্বংস করবার জন্যে 'স্প্যানিস আর্মাডা' আসছে।" এ খবর তখনও দেশের কেউ পায়নি,—শুনেই সারা ইংলন্ডে 'সাজো সাজো' রব উঠল, সকলে যথাসময়ে সাবধান হবার সুযোগ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, বোম্বেটে জন স্মিথের নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ ব্যর্থ হল না। কেবল শাস্তি থেকে মুক্তি নয়—সেই সঙ্গে সে যথেষ্ট পুরস্কারও লাভ করলে।

স্পেন থেকে মরক্কোয় বিতাড়িত হবার পর ষোড়শ শতাব্দীর মুররা ভয়ঙ্কর বোম্বেটে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের ভয়ে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়েছিল। সারা ইউরোপের শক্তি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথমে উর্জ ও পরে তার ভাই খয়েরুদ্দিনের নামে তখনকার খ্রিস্টান নাবিকদের বুক ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কারণ মূর বোম্বেটেরা কেবল জাহাজ লুট করত না,উপরন্তু খ্রিস্টানদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে আফ্রিকায় গোলাম করে রাখত এবং তাদের পথের কুকুরের মতো কষ্ট দিত। একবার আন্দ্রিয়া ডোরিয়া নামে এক নৌ-বীর বহু জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে জলযুদ্ধে মূর বোম্বেটেদের হারিয়ে দেন এবং তাদের কবল থেকে বিশ হাজার খ্রিস্টান স্ত্রী-পুরুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন—তাদের মধ্যে ইউরোপের অনেক বড়ঘরের ছেলে-মেয়েও ছিল। কিন্তু তবু মূর বোম্বেটেরা কাবু হয়ে পড়ল না। অবশেষে কয়েক শত

বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টার পরে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মূর জলদস্যুদের প্রতাপ দূর হয়। ইংরেজনৌ-সেনাপতি লর্ড এক্সমাউথ ওলন্দাজদের সঙ্গে মিলে মূর বোম্বেটেদের আস্তানা ভেঙে দেন এবং তারপর ফরাসিরা আলজিয়ার্স দেশ অধিকার করলে মুররা আর মাথা তুলতে পারলে না। ইউরোপে এমন বোম্বেটের বিভীষিকা আর কখনও হয়নি।

এরা কারা—কবেকার—কোথাকার?

আমরা পৃথিবীর বোম্বোটদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা কেবল ইউরোপীয় বোম্বেটেদেরই গল্প বলব। প্রথমেই বলে রাখি, এই গল্পগুলির ঘটনাস্থল ইউরোপ নয়—আমেরিকা।

ঘটনাগুলি পড়বার আগে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মানচিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ঠিকমধ্যবর্তী স্থানে পানামা। তার বামে প্রশান্ত মহাসাগর ও ডাইনে আটলান্টিক মহাসাগর। এখন পানামায় খাল কেটে এই দুই মহাসাগরকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি (সপ্তদশ শতাব্দী) তখন এই খাল ছিল না (পানামা খাল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাটা হয়)।

আটলান্টিক মহাসাগরের এক অংশকে বলে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র। তারই ভিতরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ—হাইতি, জামাইকা, কিউবা প্রভৃতি। কিউবার বামদিকে হচ্ছে মেক্সিকো উপসাগর। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশকে স্পর্শ করেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে, তার চারিপাশের সমুদ্রবক্ষে ও নিকটবর্তী ভূভাগে ষোড়শ থেকে সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে রোমাঞ্চকর রক্তাক্ত নাটকের একটানা অভিনয় হয়েছিল, কাল্পনিক উপন্যাসও তার কাছে হার মানে। কিন্তু সকলের কাছে আর একটু ধৈর্য প্রার্থনা করি, কারণ মূল গল্প শুরু করবার আগে স্থান-কাল-পাত্রের কথা আরও কিছু না বললে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না।

সর্বপ্রথমে কলম্বাস এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস নিজে স্পানিয়ার্ড ছিলেন না, কিন্তু স্পেনদেশের রানী ইসাবেলার আনুকূল্য লাভ করে এই অসমসাহসিক নাবিক নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অজানা সমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র পোতে

ভাসমান হয়ে, শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে, নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে, তিনি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্‌ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোনও এক অজ্ঞাতনামা (কলম্বাস এই দ্বীপটির নাম রেখেছিলেন ‘স্যান স্যালভেডর’, সম্ভবতঃ আধুনিক ‘ওয়াটলিং দ্বীপ’) দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন; আর স্পেনদেশের রাজা ও রানির নামে দ্বীপটি দখল করে, সেখানে স্পেনের রাজপতাকা প্রোথিত করেছিলেন। কাজেই স্পানিয়ার্ডরই সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে দলে দলে এসে উপনিবেশ স্থাপন করবার সুবিধা পেয়েছিল। তারা কিন্তু অধিকৃত দ্বীপগুলি সব সময়ে শাসনে বা দখলে রাখতে পারত না। ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি জাতির দুঃসাহসিক লোকেরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে জাহাজে চড়ে এসে ওই সকল দ্বীপে উৎপাত করত, আর এক একটা দ্বীপ বা তার খানিকটা, স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে দখল করে বসত। এই সব কাজে বোম্বেটেদের সাহায্য নিতে তারা কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করত না।

১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে একদল দুঃসাহসিক ইংরেজ ও ফরাসি জল-ডাকাতি করে টাকা রোজগার করবার জন্যে সেন্ট ক্রিস্টোফার দ্বীপে এসে আড্ডা গাড়ে। তারা স্পানিয়ার্ডদের অধিকৃত হিস্পানিওলা বা হাইতি দ্বীপে (পূর্বে সমগ্র দ্বীপের নাম ছিল হাইতি বা হিস্পানিওলা। পরবর্তীকালে হাইতি দ্বীপের রাজধানী সান্টো ডোমিঙ্গোর নাম অনুসারে ওই দ্বীপের পূর্বখণ্ডের নামকরণ হয় সান্টো ডোমিঙ্গো আর পশ্চিমখণ্ডের নাম ‘হাইতি’ থাকিয়া যায়। ম্যাপ দেখুন) লুটতরাজ করত, আর লুট করা শূকরের মাংস শুকিয়ে চলতি সওদাগরি জাহাজে বিক্রি করত। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তারা টর্টুগা দ্বীপে চলে যায়। মেক্সিকোর উপসাগরের মুখে দশটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে টর্টুগা দ্বীপপুঞ্জ বলে। টর্টুগা দ্বীপ ও টর্টুগা দ্বীপপুঞ্জ যে এক নয়, তা মনে রাখা দরকার।

বোম্বেটের টর্টুগা দ্বীপে নূতন করে আড্ডা গাড়লে, ইউরোপের নানা দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুঃসাহসিক দুর্বত্তেরা এসে তাদের দলে ভিড়ে যেতে

লাগল। এইরূপে বোম্বেটেরা দলে বেশ ভারি হয়ে উঠল। স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ লুট করা বা তাদের দখলি দ্বীপে বা ভূভাগে এসে হানা দেওয়া তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। স্পানিয়ার্ডরা অস্থির হয়ে উঠল।

সমুদ্রে ডাকাতি করে ফিরে তারা টর্টুগা দ্বীপে অথবা জামাইকা বা অন্য কোনও দ্বীপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। তারপর দু'এক মাসের মধ্যেই মদ খেয়ে, জুয়া খেলে ও অন্যান্য বদখেয়ালিতে সব টাকা ফুঁকে দিয়ে তারা আবার নতুন শিকারের খোঁজে জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়ত। এই সব দ্বীপের শাসনকর্তারা প্রায়ই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতো হতেন না। বোম্বেটেরা তাদের সঙ্গে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলত, নিজেদের পাপের টাকার খানিক অংশ ঘুষ দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রাখত। দুএকজন কড়া শাসনকর্তা তাদের যদি শাসনে রাখবার চেষ্টা করতেন, তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াত। কারণ বোম্বেটের দল এতটা প্রবল ছিল যে, সকলে একসঙ্গে বিদ্রোহ প্রকাশ করে যেন-তেন-প্রকারেণ সাধু শাসনকর্তাকে সেখান থেকে না তাড়িয়ে ছাড়ত না। সময়ে সময়ে, শাসনকর্তা যেখানে শাসন করছেন, সেই দ্বীপ পর্যন্ত তারা কেড়ে নিত। কাজেই সাধুতা ছিল সেখানে ব্যর্থ।

ও সব দ্বীপে স্পানিয়ার্ডরাই সংখ্যায় ছিল বেশি। তাদের শূকরের ব্যবসাই ছিল প্রধান। তারা পাল পাল শূকর পুষত এবং এই সব শূকরের রক্ষিত মাংস তারা জাহাজে করে নানা দেশে চালান দিত। ওসব জায়গায় ফরাসি, ইংরেজ বা ওলন্দাজেরও অভাব ছিল না। তারা এখানে সেখানে আড্ডা গেড়ে বসবাস করত, অনেকে তামাক বা আখের চাষ করত, আবার অনেকের শিকারই ছিল ব্যবসা। স্পানিয়ার্ডরা ছিল ঘোর অত্যাচারী, তারা সুযোগ পেলে এদের উপরও অত্যাচার করতে ছাড়ত না; এরাও তাদের দুচক্ষে দেখতে পারত না, অত্যাচারের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিত। স্পানিয়ার্ড, ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ–সবাই ওই সকল দ্বীপের আদিম অধিবাসী লাল মানুষদের বা আফ্রিকা থেকে চালানি নিগ্রোদের ক্রীতদাস

করে রাখত। অনেক শ্বেতাঙ্গকেও ইউরোপ থেকে লোভ দেখিয়ে, চুরি করে বা জোর-জবরদস্তি করে ধরে এনে ওসব দ্বীপে বিক্রি করা হত। শ্বেতাঙ্গরাই তাদের কিনত। কিন্তু মনিবদের অত্যাচার ছিল এত অমানুষিক যে, গোলামরা পালিয়ে গিয়ে বোম্বেটের দলে মিশে নিষ্ঠুর জঘন্য জীবন যাপন করাও বাঞ্ছনীয় বোধ করত।

তা হলেই অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছিল, দেখুন। স্পানিয়ার্ডরা অধিকাংশ দ্বীপের মালিক --তারা ঘোরতর অত্যাচারী; ক্ষেত-বাড়ির শ্বেতাঙ্গ মালিকরা অত্যাচারী, শিকারীরা অত্যাচারী; বোম্বেটের জলে অত্যাচারী, স্থলে অত্যাচারী; শ্বেতাঙ্গ কৃতদাসেরা প্রভুদের হুকুমে বা ব্যবহারে অত্যাচারী; লাল মানুষ বা নিগ্রো ক্রীতদাসেরা মনিবদের অত্যাচারে বা তাদের নিষ্ঠুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত হয়ে অত্যাচারী। সর্বত্র অত্যাচার। শুধু অত্যাচার নয়, পাপের বীভৎস লীলা। সুরাপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, লুটতরাজ, মারামারি, কাটাকাটি, খুন, জখম, অগ্নিকাণ্ড-- পাপ যত মূর্তিতে প্রকাশ পেতে পারে তাই। সপ্তদশ শতাব্দীর সভ্যতার চমৎকার এক পৃষ্ঠা।

বোম্বেটেদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও দুচার কথা বলে নিই, কারণ পরে আর বলবার সময় হবে না।

বোম্বেটেদের কোনও নতুন দল গঠিত হলে, সমুদ্রযাত্রা করবার আগে দলের সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হত, কবে তাদের জাহাজ ছাড়বে এবং কাকে কত বারুদ ও বন্দুকের গুলি আনতে হবে। তারপর যাত্রাকালের খাবার জোগাড় করবার ব্যবস্থা হত। তাদের প্রধান খোরাক ছিল শূকর ও কচ্ছপের মাংস। বোম্বেটের প্রায়ই জাহাজ ছাড়বার আগে ছলে-বলে-কৌশলে শূকর সংগ্রহ করত— যথামূল্যে শূকর কেনবার জন্যে কোনওদিনই তারা আগ্রহ প্রকাশ করত না।

তারপর পরামর্শসভায় স্থির হত, শিকার জুটলে কার ভাগে কত অংশ পড়বে। অবশ্য সবচেয়ে বেশি অংশ পেত কপ্তেন, তারপর জাহাজের ডাক্তার।

ছুতারমিস্ত্রীও অন্য লোকের চেয়ে বেশি অংশ লাভ করত। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও স্থির থাকত যে শিকার না জুটলে কারুর ভাগ্যে কিছুই জুটবে না।

যুদ্ধবিগ্রহে কেউ মারা পড়লে বা কারুর অঙ্গহানি হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকত। সবচেয়ে বেশি দাম ছিল ডান হাতের। তারপর যথাক্রমে বাম হাত, ডান পা ও বাম পায়ের দাম। সর্বশেষে, একটা চোখ বা হাতের বা একটা আঙুলের দাম ছিল সমান!

নিজেদের ভিতরে তাদের রীতিমতো একটা বোঝাপড়া ছিল। তাদের প্রত্যেককেই শপথ করতে হত যে, দল ছেড়ে সে পালাবে না বা লুটতরাজের কোনও জিনিসও দলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে না। কেউ অবিশ্বাসী হলে তখনই তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

এমন যে অমানুষ ও হিংস্র পশুর দল, কিন্তু দলের ভিতরে তাদেরও পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ, প্রেম ও সদ্ভাব ছিল যথেষ্ট। একের দুঃখকষ্টে অন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করত তো বটেই, উপরন্তু সেই দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য টাকা দিয়ে দেহ দিয়ে যে কোনরকম সাহায্য করতেও নারাজ হত না।

আমরা অতঃপর গল্প শুরু করব। কিন্তু এই গল্প প্রধানত যার বই থেকে নেওয়া হয়েছে তারও পরিচয় দেওয়া দরকার। তার নাম হচ্ছে আলেক্স অলিভিয়ার এক্সকুইমেলিন, জাতে তিনি ওলন্দাজ। তিনি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এক্সকুইমেলিন সাহেব আগে নিজেও একজন বোম্বেটে ছিলেন এবং এই পুস্তকে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই তার চোখের সামনেই ঘটেছিল। কোনও কোনও ঘটনা, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এমন সব বোম্বেটের মুখে তিনি নিজের কাণে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি যা দেখেছেন ও যা শুনেছেন সমস্তই হুবহু লিখে ১৬৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সে পুস্তকের এত আদর হয়েছিল যে, ইউরোপের অধিকাংশ ভাষাতেই তার অনুবাদ দেখা যায় এবং এতকাল পরেও তার পুস্তকের নূতন সংস্করণ হচ্ছে। বোম্বেটের নিজের

মুখেই বোম্বেটের কাহিনী শুনতে কার না আগ্রহ হয়? আর এক্সকুইমেলিন সাহেবের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা হচ্ছে এই যে, কোনও অন্যায়কেই কোথাও তিনি গোপন করেননি বা ফেনানো ভাষার আড়ালে অস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করেননি। তার ভাষা সহজ ও সরল। এইজনেই তার কথিত কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নয়।

‘পিটার দি গ্রেট’—বোম্বেটের আদিপুরুষ

টর্টুগা দ্বীপে সর্বপ্রথমে যে জলদস্যু বিশেষ নামজাদা হয়, জাতে সে ফরাসি। তার নাম ছিল ইংরেজিতে ‘পিটার দি গ্রেট’। সে একলা নিজের বুদ্ধিতে জনকয় লোকের সাহায্যে যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল, তাইতেই তার ডাকনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন সে একখানা বড় নৌকোয় চড়ে হাইতি দ্বীপের কাছে সমুদ্রে শিকারের সন্ধানে ফিরছিল এবং তার সঙ্গে ছিল আটাশজন বোম্বেটে।

কয়েকদিন ধরে শিকারের অভাব, নৌকোয় খাবার ফুরিয়ে এল বলে। সকলকার মন বড় খারাপ,—পেট চলবে কেমন করে?

এমন সময়ে সমুদ্রের বুকে দেখা গেল, স্পেনের এক ‘ফ্লোটা’। ফ্লোটা হচ্ছে অনেকগুলো বড় বড় জাহাজের সমষ্টি এবং তাদের কাজ হচ্ছে ইউরোপের জিনিস আমেরিকার বন্দরে আনা ও আমেরিকার মাল ইউরোপে নিয়ে যাওয়া।

দেখা গেল, মস্ত একখানা জাহাজ ‘ফ্লোটা’র দলছাড়া হয়ে অনেক দূরে এগিয়ে পড়েছে।

পিটার তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে বললে, “ভাই সব! যা থাকে কপালে! ওই দলছাড়া জাহাজখানাকে আমরা আজ দখল করবই করব!

পিটার অসম্ভব কথা বললে। একখানা নৌকো, ঊনত্রিশজন মাত্র তার আরোহী! এরই জোরে শতশত লোকের সঙ্গে লড়াই করে অতবড় জাহাজ দখণ করা আর লতা দিয়ে হাতি বাঁধবার চেষ্টা করা একই কথা।

কিন্তু পিটারের দলের লোকেরাও আসন্ন অনাহারের সম্ভাবনায় তারই মতন মরিয়া। তারাও পিটারের কথায় সায় দিয়ে বললে, তাই সই, সর্দার!

নৌকো বেয়ে জাহাজের কাছে এসে বোম্বেটেরা বুঝলে, দিনের আলোয় এমন অসাধ্যসাধন করা একেবারেই অসম্ভব। জাহাজের লোকরা একবার দেখতে

পেলে মরণের মুখ থেকে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। অতএব তারা বুদ্ধিমানের মতো সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধ্যা এল।

পিটার বললে, আমাদের নৌকার তরায় ছ্যাঁদা করে দিই এস! সেই ছ্যাঁদা দিয়ে জল ঢুকে আমাদের নৌকোখানাকে ডুবিয়ে দিক। এই অকূল সমুদ্রে নৌকো ডুবে গেলে আমাদের আর বাঁচবার কি পালাবার কোনও উপায়ই থাকবে না। তাহলে আমরা আরও বেশি মরিয়া হয়ে লড়তে পারব আর আরও তাড়াতাড়ি জাহাজে ওঠবার জন্যে চেষ্টা করব। অত বড় জাহাজ আমাদের পক্ষে এখন ভয়ের কারণ বটে। কিন্তু তখন ওই জাহাজকেই মনে করব আমাদের একমাত্র আশ্রয়!

তখনই এই অদ্ভুত প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হল, ছ্যাঁদা করা নৌকে ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

কিন্তু তার আগেই সাঁঝের আবছায়ায় গা ঢেকে বোম্বেটেরা চুপিচুপি একে একে জাহাজের উপর উঠতে লাগল—ছায়ামূর্তির সারির মতো। তাদের প্রত্যেকেরই কাছে একটি করে পিস্তল ও একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই!

জাহাজের এক কামরায় বসে কাপ্তেন ও আরও কয়েকজন লোক নিশ্চিন্ত আরামে তাস খেলছিলেন।

আচম্বিতে একটা লোক কামরায় ঢুকে কাপ্তেনের বুকের উপরে পিস্তল ধরে বললে, একটু নড়েচ কি গুলি করেচি!

কাপ্তেন একেবারে থ। এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! কাপ্তেনের অন্যান্য সঙ্গীরা সচকিতকণ্ঠে বলে উঠল, যীশু আমাদের রক্ষা করুন! কে এরা! কোত্থেকে এল? এরা কি সাক্ষাৎ শয়তান!

ততক্ষণে পিস্তল বাগিয়ে ও তরবারি উঁচিয়ে আরও কয়েকজন বোম্বেটে কামরায় এসে হাজির হয়েছে এবং দলের বাকি কয়েকজন লোক সর্বাগ্রে গিয়ে

জাহাজের অস্ত্রশালা দখল করে বসেছে! কেউই এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, যারা বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাদের প্রত্যেককেই মরতে হল!

তখন জাহাজের বাকি সকলেই ভয়ে ভয়ে বোম্বেটেদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে! পরে শোনা গেল, সন্ধ্যার আগে কেউ কেউ নৌকোখানাকে দেখতে পেয়ে নাকি বলেছিল, ওখানা বোম্বেটে-নৌকো।

জবাবে কাপ্তেন বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, বয়ে গেল! আমার এত বড় জাহাজ, এত লোকবল, আমি কি ওই ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো নৌকোখানাকে দেখে ভয় পাব? আমার জাহাজের সমান জাহাজ এলেও আমি থোড়াই কেয়ার করি।

জাহাজের জনকয় মাহিনা করা নাবিককে দলে রেখে, পিটার নাকি বাকি সবাইকে ডাঙায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে। তারপর সেই মূল্যবান মালে বোঝাই সুবৃহৎ জাহাজ নিয়ে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করলে। পিটার আর কখনও আমেরিকায় ফিরে আসেনি।

টর্টুগার যে সব লোক স্পানিয়ার্ডদের অত্যাচারে অবিচারে কাবু হয়ে হাহাকার করছিল, তারা যখন পিটারের এই অদ্ভুত বিজয়কাহিনী ও অপূর্ব সম্পদ লাভের কথা শুনলে, তখন একবাক্যে বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, আমরাও তবে বোম্বেটে হব,—স্পানিয়ার্ডদের ওপরে প্রতিশোধ নেব!

কিন্তু জল-ডাকাত হতে গেলে আগে দরকার অন্তত একখানা করে ছোট জাহাজ বা একখানা করে বড় নৌকো। তার মূল্য কে দেয়? ভেবেচিন্তে তারা উপায় আবিষ্কার করলে। বন্দরে বন্দরে স্পানিয়ার্ডরা ছোট ছোট নৌকো করে চামড়া ও তামাক প্রভৃতি সংগ্রহ করত। তারপর তারা সেই সব মাল নিয়ে হাভানা শহরে গিয়ে হাজির হত। কারণ ইউরোপ থেকে স্পানিয়ার্ডরা সেইখানেই ব্যবসা করতে আসত।

নতুন বোম্বেটেরা দল পাকিয়ে সেই সব মালবোঝাই জাহাজ স্পানিয়ার্ডদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে আরম্ভ করলে। তারপর সেই লুটের মাল

বেচে তারা বড় বোম্বেটে হবার মূলধন সংগ্রহ করে ফেললে। ব্যাপারটা শুনতে খুব সোজা বটে, কিন্তু এর জন্যে বড় কম মারামারি, রক্তপাত ও নরহত্যা হল না।

তার মাস খানেক পরেই স্পেনদেশিয় ব্যবসায়ীদের বড় বড় দুখানা জাহাজ বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়ল—সে জাহাজ দুখানার ভিতরে ছিল প্রচুর সোনা ও রুপো।

টর্টুগার যে সব লোক তখনও নতমাথায় অত্যাচার সহ্য করছিল, তারাও আর লোভ সামলাতে পারলে না, তারাও বোম্বেটেদের দলে যোগ দিলে! বছর দুইয়ের মধ্যেই লুটের ঐশ্বর্যে টর্টুগারও যেমন শ্রীবৃদ্ধি হল, ব্যাঙের ছাতার মতো বোম্বেটের দলও তেমনই বাড়তে লাগল! তখন এই দ্বীপটি একরকম বোম্বেটেদেরই স্বর্গ হয়ে দাঁড়াল—স্পানিয়ার্ডরা সেখান থেকে একেবারেই পিটটান দিতে বাধ্য হল!

দেখতে দেখতে টর্টুগা দ্বীপে বোম্বেটে জাহাজের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল কুড়িখানারও বেশি। বুকে বসে এই দাড়ি ওপড়ানো স্পানিয়ার্ডরা আর সইতে পারলে না, দেশে—অর্থাৎ স্পেনে খবর পাঠিয়ে আত্মরক্ষা ও বোম্বেটে দমন করবার জন্যে প্রকাণ্ড দুখানা যুদ্ধজাহাজ অনাবার বন্দোবস্ত করলে।

পর্তুগিজ ও ব্রেজিলিয়ানো

এ অঞ্চলে এক বোম্বেটে ছিল, তার নাম বার্থোলোমিউ পর্তুগিজ। নাম শুনেই বোঝা যায় তার জন্ম পর্তুগালে। সবাই তাকে পর্তুগিজ বলে ডাকত। এর কাহিনী পিটার দি গ্রেটের চেয়েও বিচিত্র।

জামাইকা দ্বীপের কাছে সে একখানা বজরা নিয়ে শিকার অন্বেষণ করছিল। তার সঙ্গে ছিল চারটে ছোট কামান ও ত্রিশজন লোক।

সমুদ্রের মাঝখানে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ দেখতে পেয়ে পর্তুগিজ তার কাছে বজরা নিয়ে গেল।

সে বড় যে-সে জাহাজ নয়। তার ওপরে আছে কুড়িটা মস্ত মস্ত কামান ও সত্তর জন যোদ্ধা। আর আছে অনেক যাত্রী ও নাবিক।

কিন্তু পর্তুগিজ জানত না ভয় কাকে বলে। চারটে পুঁচকে কামান, ত্রিশজন মাত্র লোক ও বজরা নিয়েই সে সেই জাহাজখানাকে আক্রমণ করলে। প্রথম আক্রমণ সফল হল না। পর্তুগিজকে পিছনে হটে আসতে হল।

তারপর খানিক বিশ্রাম করে সে আবার সতেজে আক্রমণ করলে। আবার বড় বড় কামানের গোলা হজম করতে না পেরে সে পিছিয়ে এল। তার খানিক পরে আবার আক্রমণ! এমনই বারবার আক্রমণ ও সুকৌশলে অথচ সতেজে যুদ্ধ করে অনেকক্ষণ পরে পর্তুগিজ সত্যসত্যই সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানাকে দখল করে ফেললে!

কিন্তু তার এত বীরত্বও ব্যর্থ হল। কারণ সেই বিজিত জাহাজখানাকে নিয়ে খানিক দূর এগুতে না এগুতেই, আচম্বিতে দৈবগতিকে স্পানিয়ার্ডদের আরও তিনখানা প্রকাণ্ড জাহাজের আবির্ভাব হল। পর্তুগিজ এদের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারলে না—জয়ের আনন্দ ভাল করে ভোগ করতে না করতেই সদলবলে তাকে বন্দি হতে হল!

একটু পরেই উঠল বেজায় ঝড়। যে বিরাট জাহাজে বোম্বেটেরা বন্দি হয়ে ছিল, সেখানা অন্য জাহাজগুলোর সঙ্গ হারিয়ে অনেক কষ্টে একটা বন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

পর্তুগিজকে দেখেই ত্রস্তস্বরে বলে উঠল, এ বদমাইশ বোম্বেটেকে আমরা চিনি! এ যে পর্তুগিজ! এ যে আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছে, অনেক লোক খুন করেছে!

যে শহরের বন্দরে জাহাজ থেমেছিল, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট বোম্বেটেদের ডাঙায় পাঠাতে হুকুম দিলেন। কেবল পর্তুগিজকে পাঠাতে নিষেধ করলেন—পাছে সেই ফাঁকে কোনগতিকে সে পালিয়ে যায়, কারণ কিছুদিন আগে এই শহরেরই জেল ভেঙে সে লম্বা দিয়েছিল। তার জন্যে জাহাজের ওপরেই ফাসিকাঠ খাড়া করা হল। পরদিন সকালেই তাকেলটকে দেওয়া হবে। এই চমৎকার সুখবরটি পর্তুগিজকে ঘটা করে শোনানো হল। শুনে সে যে খুশি হয়ে হাসেনি, সেটা আর না বললেও চলে।

জাহাজে তাকে যেখানে রাখা হয়েছিল,সেখানে বড় বড় দু'টো মাটির খালি জালা ছিল—এই জালায় স্পানিয়ার্ডরা মদ রাখত। পর্তুগিজ একটুও সাঁতার জানত না, কাজেই জলে লাফিয়ে পড়ে সে যে সাঁতরে পালাবে, তারও উপায় নেই। অথচ কাল পৃথিবীর সূর্যোদয়ের সঙ্গেই তার জীবনের সূর্যস্ত। ফাঁসিকাঠে দোল খাবার শখ তার মোটেই ছিল না। কোনওরকমে সে মাটির জালা দুটোর মুখ এঁটে বন্ধ করলে। তারপর চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল নেহাৎ ভালমানুষটির মতো। তার আচরণের কারণ কেউ বুঝতে পারলে না।

রাত হল। সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করে বসে বসে ঢুলছে।

হঠাৎ পর্তুগিজ বাঘের মতো তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু টের পাবার আগেই সেপাই ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

পর্তুগিজ জালাদুটো জলে নামিয়ে দিয়ে নিজেও জাহাজ ত্যাগ করলে। মুখবন্ধ করা জালা জলে ভাসতে লাগল। পর্তুগিজ তাদের উপরে ভর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে উঠল। তারপর গভীর অরণ্যে ঢুকে একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে বসে রইল—কারণ সকাল হতে দেরি ছিল না।

সকাল। কর্তৃপক্ষ জাহাজে এলেন—একটা জাঁহাবাজ বোম্বেটেকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠাবার জন্য। কিন্তু দেখা গেল, ফাঁসিকাঠে যে দুলবে সে অদৃশ্য!

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। দলে দলে লোক বন তোলপাড় করে খুঁজে দেখলে, কিন্তু পর্তুগিজের দেখা না পেয়ে হতাশভাবে ফিরে এল।

পর্তুগিজ তখন জঙ্গল ভেঙে চলতে শুরু করেছে। সমুদ্রের ধারে পাথর উলটে 'সেল' মাছ কুড়িয়ে এনে কোনরকমে পেটের জ্বালা নিবারণ করে। কাছে ছিল শুকনো লাউয়ের খোল, আর তাতে একটুখানি জল,—তাতেই তেষ্টা মেটায়। এইভাবে একশ কুড়ি মাইল পথ পার হল!

পথের মাঝে মাঝে নদী পড়েছে—অথচ সে সাঁতার জানে না। কেমন করে সে বাঁধা দূর করলে, তাও বড় কম আশ্চর্য কথা নয়!

সমুদ্রের ধারে জাহাজ ভাঙা একখানা তক্তা পাওয়া গেল, তার গায়ে বেঁধানো ছিল গোটাকয়েক মস্তবড় পেরেক বা হুক। সে বসে বসে পাথরের উপরে ঘষে ঘষে পেরেকের গায়ে অনেকটা ছুরির মতো ধার করলে। তারপর সেই অদ্ভুত ছুরির সাহায্যে গাছের ডালপালা কেটে ছোটখাট ভেলার মতো একটা কিছু বানিয়ে গভীর নদী পার হল। আপনারা অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, এ রূপকথা? না, এ সম্পূর্ণ সত্য কথা!

একশ কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে পর্তুগিজ একদল চেনা বোম্বেটের দেখা পেলে। ইতিমধ্যে চোদ্দদিন কেটে গেছে।

বন্ধুদের কাছে নিজের বিপদের গল্প বললে। শুনে তারা যে তাকে খুব বাহাদুর দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পর্তুগিজ বললে, ভাই, আমাকে একখানা নৌকো আর কুড়িজন লোক দাও। আমি প্রতিশোধ নেব।

তারা আপত্তি করলে না।

আট দিন পরে সেই আশ্চর্য সাহসী পর্তুগিজ কুড়িজন সঙ্গীর সঙ্গে যে জাহাজে বন্দি হয়েছিল, যার ওপরে এখনও তার জন্যে আনা ফাঁসিকাঠ দাঁড়িয়ে আছে, আবার তার কাছেই বুক ফুলিয়ে ফিরে এল এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানাকে আবার বন্দি করে ফেললে! উপন্যাসেও এমন বিচিত্র কাহিনী পড়া যায় না!

কিন্তু নিয়তি আবার তাকে নিষ্ঠুর পরিহাস করলে! প্রাণের ভয় থেকে এখন সে মুক্ত এবং মাল বোঝাই জাহাজ পেয়ে এখন সে ধনবান! কিন্তু তার আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হল না। ভবিষ্যতের অনেক সুখ-সৌভাগ্যের কল্পনা করতে করতে দিনকয় মস্ত জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে সে ঘুরে বেড়ালে—কিন্তু তারপরেই দুর্ভাগ্য আবার ঝড়ের মূর্তিতে এসে পর্তুগিজের এই নতুন পাওয়া ঐশ্বর্যকে পাতালের অতল তলে তলিয়ে দিলে! সঙ্গীদের নিয়ে একখানা ভিডিতে চড়ে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু আবার সে গরিব—নিছক গরিব!

সে জামাইকা দ্বীপে এসে উঠল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তার ওপরে আর কোনদিন প্রসন্ন হননি। তার এত বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বও আর কোনও কাজে লাগল না। অবশ্য এ সব দুষ্প্রাপ্য গুণ আজীবনই তার কাজে লাগত, যদি সে অসৎ পথ অবলম্বন না করত। পর্তুগিজ যদি সত্যিকার মানুষ হত, তাহলে মরণের পরেও সে আজ মরত না, হয়তো পৃথিবীতে দেশে দেশে চিরস্মরণীয় হয়েই থাকতে পারত।

আর একজন বোম্বেটেও ওই সময়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অনেককাল ব্রেজিলে বাস করেছিল বলে তার নাম হয়েছিল ব্রেজিলিয়ানো।

জলদস্যুর দলে ঢুকে প্রথমে সে সাধারণ বোম্বেটেরই মতন নিম্নশ্রেণীতে কাজ করত। কিন্তু নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধির গুণে সে শীঘ্রই সকলের স্নেহের ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল।

যে দলে সে ছিল তার কাপ্তেনের সঙ্গে একবার সেই দলের অনেকের মনোমালিন্য হয়। তারা তখন দল ছেড়ে চলে এল এবং সকলের সম্মতি অনুসারে ব্রেজিলিয়ানোই দলপতি বা কাপ্তেনের পদ লাভ করলে।

নতুন কাপ্তেন দিনকয়েক পরেই নিজের বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় দিলে। আমেরিকায় তখন অনেক সোনা, রুপো ও অন্যান্য দামী ধাতু পাওয়া যেত। স্পানিয়ার্ডরা সেই সব ধাতুর বার বা তাল জাহাজে চাপিয়ে স্পেনে চালান দিত। এমনই সোনা-রুপোর তালনিয়ে একখানা মস্ত জাহাজ স্পেনে বা অন্য কোথাও যাচ্ছিল, ব্রেজিলিয়ানো হঠাৎ তাকে ধরে ফেললে। স্পানিয়ার্ডরা যথাসাধ্য বাধা দিয়েও কিছু করে উঠতে পারলে না। ব্রেজিলিয়ানো বামাল সমেত সেই জাহাজখানাকে গ্রেপ্তার করে জামাইকা দ্বীপে এসে উঠল। তার নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল!

কিন্তু ব্রেজিলিয়ানো ছিল যেমন মাতাল, তেমনই গোঁয়ার ও নির্দয়। যখন সে ছুটি নিয়ে ডাঙায় এসে ফুর্তি করত, তখন কেউ তার সামনে দাঁড়াতে ভরসা করত না। মদ খেয়ে রাজপথে হুল্লোড় করে বেড়াবার সময়ে যাকে সমুখে পেত তাকেই মেরে-ধরে হাড় গুড়িয়ে দিত। তার গায়েও ছিল অসুরের মতো ক্ষমতা, তাই কেউ বাধা দিতে বা প্রতিবাদ করতেও সাহস করত না।

সময়ে সময়ে এক পিপে মদ নিয়ে রাস্তার ওপরে বসে থাকত। সামনে দিয়ে কোনও পথিক গেলেই ডেকে বলত—‘এসো ভায়া, আমার সঙ্গ মদ খেয়ে ফুর্তি করে যাও!’ পথিক যদি বলত, “না, আমি মদ খাব না!”—তাহলেই আর রক্ষে নেই, ব্রেজিলিয়ানো অমনই পিস্তল বার করে বলত, “মদ খাবে, না খাবি খাবে?”

কখনও কখনও তার আর এক খেয়াল হত। রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ কেউ গেলেই সে তাদের জামাকাপড়ে সর্বাঙ্গে হুড়হুড় করে মদ ঢেলে দিত।

স্পানিয়ার্ডদের ওপরে ছিল তার বিষম আক্রোশ। একবার সে শূকর চুরি করতে যায়। কিন্তু চুরি করতে না পেরে কয়েকজন স্পানিয়ার্ডকে ধরে শুধোলে, তোমরা কোথায় শুওর লুকিয়ে রেখেছ বলো।

তারা বললে, শুওরের সন্ধান আমরা জানি না।

ব্রেজিলিয়ানো দুচোখ পাকিয়ে বললে, কী জান না? রোসো, দেখো তবে মজাটা! ওরে, এদের ধরে রোস্ট বানিয়ে ফ্যাল তো! শূওর যখন পেলুম না তখন মানুষেরই রোস্ট হোক!

সাহেবরা মাংসের মধ্যে কাঠের শলাকা বিঁধিয়ে আগুনের আঁচে রেখে রোস্ট তৈরি করে। ব্রেজিলিয়ানোর চালারা তখনই সেই হতভাগ্য স্পানিয়ার্ডদের জীবন্ত দেহের ভিতরে পড় পড় করে কাঠের শলা চালিয়ে দিলে এবং জীবন্ত অবস্থাতেই তাদের দেহগুলোকে আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখলে। ধীরে ধীরে তাদের জ্যান্ত দেহগুলো আগুনের আঁচে সিদ্ধ হতে লাগল।

অভাগাদের পরিত্রাহি চিৎকারে আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠল, কিন্তু ব্রেজিলিয়ানোর মন তাতে একটুও গলল না—সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই আর্তনাদ শুনতে লাগল, যেন খুব মিষ্টি গানই শুনছে!

একদিন ঝড়ে তার জাহাজ ডুবে গেল—ঝড়ে জাহাজ ডুবে যাওয়া ছিল তখনকার কালে খুব সহজ ব্যাপার। ব্রেজিলিয়ানো সঙ্গীদের নিয়ে একখানা নৌকোয় চড়ে কোনওরকমে ডাঙায় এসে উঠল। কিন্তু সেখানেও আবার নূতন বিপদ! দেখা গেল, একশ জন বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার স্পানিয়ার্ড তাদের দিকে আবার এক নতুন ঝড়ের মতন বেগে তেড়ে আসছে! বোম্বেটেদের সংখ্যা ত্রিশজনের বেশি নয়! তিনগুণেরও বেশি লোকের সঙ্গে কেউ কখনও যুঝতে পারে? এবারে ব্রেজিলিয়ানোর লীলাখেলা বুঝি সাঙ্গ হয়!

অন্য কেউ হলে তখনই বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করত। কিন্তু ব্রেজিলিয়ানো দমবার পাত্র নয়। সে দলের লোকদের ডেকে নির্ভয়ে বললে, ভাই সব! স্পানিয়ার্ড কুকুররা তেড়ে আসছে—আসুক! ওরা বাগে পেলে আমাদের ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে! আমরা হচ্ছি বীর সৈনিক,—এসো আমরা লড়াই করতে করতে বীরের মতন মরি!

লড়াই শুরু হল—বোম্বেটেরা সবাই মরতে প্রস্তুত! এখন মরবার আগে যে যত শত্রু নিপাত করতে পারে, তারই তত বাহাদুর! বোম্বেটেরা এমন আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যস্থির করে বন্দুক ছুঁড়তে লাগল যে, প্রায় প্রত্যেক গুলিতেই এক একজন ঘোড়সওয়ারের পতন হয়! স্পানিয়ার্ডরা আর কাছে আসতে সাহস পেলে না, দূর থেকেই যুদ্ধ করতে লাগল।

এক ঘণ্টা লড়াই চলল। শেষটা বোম্বেটেদের গরম গরম গুলি আর হজম করতে না পেরে স্পানিয়ার্ডরা ভয়ে পিটুটান দিলে। তাদের প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ জন লোক হত বা আহত হয়ে মাটির ওপরে ছড়িয়ে পড়ে রইল। যারা তখনও বেঁচে ছিল, বোম্বেটেরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথার খুলি ফাটিয়ে তাদেরও ভবযন্ত্রণা শেষ করে দিলে। বোম্বেটেদের দলে হত হয়েছিল দুজন ও আহত হয়েছিল দুজন মাত্র লোক!

বোম্বেটেরা তখন স্পানিয়ার্ডদের সওয়ারহীন ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে জয় জয় নাদে নতুন শিকারের খোঁজে যাত্রা করলে।

মারি তো গণ্ডার

এইবারে আমরা যে ভয়ঙ্কর ও অতুলনীয় বোম্বেটের কথা আরম্ভ করব, তার নাম হচ্ছে ফ্রান্সিস্ লোলোনেজ। জাতে ফরাসি। রোমাঞ্চকর তার কাহিনী।

ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয়ে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজে আসে। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পর ছাড়া পায়। কিন্তু তারপর সে আর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে হাইতি দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। প্রথমে হয় শিকারি, তারপর বোম্বেটে। তার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভয়াবহ হবে এবং সে যে কত প্রলয়কাণ্ডের অনুষ্ঠান করবে, কর্তৃপক্ষ যদি তা কল্পনাও করতে পারতেন, তাহলে কখনই তাকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিতেন না। বোম্বেটেরূপে সে হয়ে উঠেছিল মূর্তিমান নরপিশাচ! অথচ তার সাহস, বুদ্ধি, বীরত্ব, উৎসাহ ও উদ্যম ছিল অসাধারণ। মানুষ এইসব দুর্লভ গুণের জন্যে আজন্ম সাধনা করে। কিন্তু অপাত্রে এইসব গুণ যে কতটা সাংঘাতিক হতে পারে, লোলোনেজ হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টর্টুগা দ্বীপ তখন ফরাসিদের অধিকারে এসেছে। সেখানকার লাটও ফরাসি। তখন স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্ক ছিল সাপ আর নেউলের সম্পর্ক।

আগেই বলেছি, এখানকার লাটেরা প্রায়ই সাধু মানুষ হতেন না, তারা নিজেরাই বোম্বেটে পুষতেন। টর্টুগার ফরাসি লাট লোলোনেজকে বুদ্ধিমান ও সাহসী দেখে তার উপরে দয়া করলেন। অর্থাৎ তাকে একখানা জাহাজ ও লোকজন দিয়ে কাপ্তেন করে দিলেন। তারপর কাপ্তেন লোলোনেজ সমুদ্রের নীলজলে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে বেরুল। কিন্তু সে-ও যদি তখন নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারত, তাহলে সভয়ে এ পথ ছেড়ে ফিরে আসত। অদৃষ্টকে আগে থাকতে দেখা গেলে পৃথিবীর অনেক দুঃখই ঘুঁচে যেত—মানুষ এমন অন্ধের মতো বিপথে ঘুরে মরত না।

প্রথম কিছুকাল বেশ সুখেই কাটল। লোলোনেজ উপর উপরি স্পানিয়ার্ডদের কয়েকখানা ধনরত্নে ও বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ জাহাজ দখল করে ডাকসাইটে নাম কিনে ফেললে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পানিয়ার্ডদের ওপরে তার ভীষণ নিষ্ঠুরতার কাহিনীও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—তারা বুঝলে, আবার এক মারাত্মক আপদের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারাও মরিয়া হয়ে উঠল! লোলোনেজ তাদের আক্রমণ করলে তারা আর সহজে আত্মসমর্পণ করতে চাইত না—কারণ তারা বুঝে নিয়েছিল যে লোলোনেজের কাছে তাদের ক্ষমা নেই, সে তাদের কয়েদ করতে পারলে বিষম যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণবধ না করে ছাড়বে না। তার চেয়ে লড়াই করে বা জলে ডুবে মরা ঢের ভাল।

তারপরইলোলোনেজ অদৃষ্টের কাছ থেকে প্রথম ধমক খেলে। আচম্বিতে একদিন নাবিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু ঝড় এসে তার জাহাজ ডুবিয়ে দিলে। সে আর তার সঙ্গীরা সমুদ্রের কবল থেকে কোনগতিকে বাঁচল বটে, কিন্তু ব্রেজিলিয়ানোর মতো সেও তীরে উঠে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দলে দলে স্পানিয়ার্ড অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসছে দলবদ্ধ যমের মতো!

যুদ্ধ হল। কিন্তু শত্রুরা দলে এত ভারি ছিল যে, লোলোনেজের সঙ্গীরা অধিকাংশই প্রাণ হারালে—যারা বাঁচল, বন্দি হল।

লোলোনেজও আহত হল, কিন্তু চালাকির জোরে শত্রুদের চোখে ধুলো দিলে। নিজের ক্ষতের রক্তের সঙ্গে তাড়াতাড়ি সমুদ্র তীরের বালি মিশিয়ে সে তার মুখে ও দেহের নানা জায়গায় মাখিয়ে ফেললে এবং বোম্বেটেদের মৃতদেহের সঙ্গে মিশিয়ে মড়ার মতো মাটিতে পড়ে রইল। শত্রুরা তাকে মৃত মনে করে চলে গেল।

লোলোনেজ তখন উঠে বনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। আগে নিজের দেহের ক্ষতস্থানগুলো যেমন তেমন করে ব্যান্ডেজ করে ফেললে। তারপর এক শহরে গিয়ে স্পানিয়ার্ডের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলে।

স্পানিয়ার্ডরা অনেক ক্রীতদাস রাখত। কয়েকজন ক্রীতদাসের সঙ্গে তার আলাপ হল এবং দিনকয়েকের ভিতরেই সে আলাপ জমিয়ে তুলল রীতিমতো।

সে তাদের বললে, তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তাহলে আমি তোমাদের স্বাধীন করে দেব। তোমাদের মনিবের একখানা নীেকো চুরি করে আমার সঙ্গে চলো—আমি তোমাদের রক্ষা করব।

অবশেষে তারা রাজি হয়ে গেল। এবং একখানা নৌকো চুরি করে লোলোনেজের সঙ্গে জলপথে বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে স্পানিয়ার্ডরা লোলোনেজের সঙ্গীদের খুব সাবধানে বন্দি করে রাখলে। এবং যখন শুনলে যে লোলোনেজ আর বেঁচে নেই, তখন তাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। এত বড় শত্রু নিপাত হয়েছে শুনে চারিদিকে আলোকমালা সাজিয়ে তারা উৎসবে মত্ত হয়ে উঠল।

লোলোনেজ ফিরে এসে সব দেখলে—সব শুনলে। তারপর সেখান থেকে সরে পড়ে একেবারে টর্টুগা দ্বীপে এসে হাজির!

ওয়েস্ট ইন্ডিজে যত শয়তান আছে, এই দ্বীপ হচ্ছে তাদের নিরাপদ স্বদেশ। তার উপরে লোলোনেজ হচ্ছে তখন একজন নামজাদা ব্যক্তি—তার কীর্তি কাহিনী লোকের মুখে মুখে। সুতরাং এখানে এসে একখানা ছোটখাট জাহাজ ও লোকজন জোগাড় করতে তার বেশিদিন লাগল না। একুশজন লোকও দরকার মতোহাতিয়ারজোগাড় করে এবারে সে কিউবা দ্বীপেরদিকে বেরিয়ে পড়ল। এই দ্বীপের দক্ষিণে এক শহর তখন তামাক, চিনি ও চামড়ার ব্যবসার জন্যে বিখ্যাত। লোলোনেজ আন্দাজ করলে যে, সেখানে নিশ্চয়ই কোনও বড়গোছের শিকার পাওয়া যাবে।

নিজেদের সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে ধরতে তাকে দেখেই চিনে ফেললে এবং তখনই চটপট দ্বীপের লাটসাহেবের কাছে গিয়ে ধর্না

দিয়ে পড়ে বললে, হুজুর, রক্ষা করুন লোলোনেজ আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছে!

লাটসাহেবের কাছে তখন খবর গিয়ে পৌচেছে যে, লোলোনেজ আর বেঁচে নেই। তাই তিনি জেলেদের কথায় নির্ভর করতে পারলেন না। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে তিনি জেলেদের সঙ্গে একখানা বড় জাহাজ, নব্বইজন সৈনিক ও দশটা কামান পাঠিয়ে দিলেন। জাহাজের সেনাপতির ওপরে হুকুম রইল—'বোম্বেটে বিনাশ না করে তিনি যেন ফিরে না আসেন। প্রত্যেক বোম্বেটেকে ফাঁসিকাঠে লটকে আসতে হবে—কেবল দলের সর্দার লোলোনেজ ছাড়া। তাকে জ্যান্ত বন্দি করে হাভানা শহরে ধরে আনতে হবে।' জাহাজের সঙ্গে একজন জল্লাদও চলল।

জাহাজখানা ঘটনাস্থলে এল। বোম্বেটেদের গুপ্তচর সর্দারকে এসে খবর দিলে— লাটসাহেবের জাহাজ তাদের ধরবার জন্যে বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছে।

কিন্তু লোলোনাজ এত সহজে ভড়কে যাবার ছেলে নয়। সে বললে, আমি পালাব না। ওই জাহাজখানাকেই আমরা বন্দি করব। আমাদের একখানা ভাল জাহাজ দরকার!

বোম্বেটেরা জনকয় জেলেকে ধরে ফেললে। লোলোনেজ তাদের বললে, আজ রাত্রে বন্দরে ঢোকবার পথ আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। নইলে তোদের খুন করব।

জেলেরা বাধ্য হয়ে সেই রাত্রে তাদের নিয়ে বন্দরে গিয়ে ঢুকল।

লাটের জাহাজের প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, কে তোমরা?

প্রাণের দায়ে জেলেরা বললে, আমরা জেলে।

—বোম্বেটেরা এখন কোথায়?

—আমরা কোনও বোম্বেটে দেখিনি।

জাহাজের লোকরা ভাবলে, তাদের দেখে কাপুরুষ বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই ভয়ে লম্বা দিয়েছে। ভোর যখন হয় হয় তাদের ভুল ভাঙল তখন। বোম্বেটের দল দুই পাশ থেকে জাহাজ আক্রমণ করেছে!

স্পানিয়ার্ডরা বীরের মতো লড়াই করলে, কিন্তু তবু হেরে গেল। এরা দুর্জয় শত্রু, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিজয়ী লোলোনেজ বললে, স্পানিয়ার্ডগুলোকে একে একে আমার সামনে নিয়ে এসো।

বন্দীদের একে একে সর্দারের সামনে আনা হতে লাগল।

লোলোনেজ বললে, একে একে এদের মাথা কেটে ফেলো।

একে একে তাদের মাথা উড়ে গেল।

সবশেষে নিয়ে আসা হল সেই জল্লাদকে। জাতে সে কাফ্রি।

জল্লাদ সর্দারের হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমাকে মারবেন না হুজুর! আপনি যা জানতে চান সব কথা খুলে বলব—কিছু লুকোব না।

লোলোনেজ তাকে গোটাকয়েক গুপ্তকথা জিজ্ঞাসা করলে। প্রাণরক্ষার আশায় সে সব কথার সঠিক জবাব দিলে।

লোলানেজ বললে, আর কিছু জানিস না?

—না হুজুর!

লোলোনেজ বললে, এ কালামানিককে নিয়ে আর আমার দরকার নেই। এর মাথাটা কেটে ফেলো।

জল্লাদেরও মাথা উড়ে গেল। কেবল একজন লোককে বোম্বেটেরা বধ করলে না। তাকে ডেকে লোলোনেজ বললে, যা, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যা! তোদের লাটসাহেবকে আমার এই কথাগুলো জানিয়ে দিস :আজ থেকে কোনও স্পানিয়ার্ডকে আমি আর একফোটাও দয়া করব না। লাটসাহেব আমাদের ওপরে

যে অসীম দয়া প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন তাও আমি কখনও ভুলব না। আমি খুব শীঘ্রই তার ওপরেও ঠিক সেইরকম দয়া দেখাবার জন্যে ফিরে আসব।

লাটসাহেব সব শুনে রাগে তিনটে হয়ে বললেন, আচ্ছা, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এবার থেকে কোনও বোম্বেটেকে হাতে পেলে আমিও ছেড়ে কথা কইব না—তার একমাত্র দণ্ড হবে প্রাণদণ্ড!

হাভানার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বললেন, ‘‘কখনও আমন প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়! তাহলে বোম্বেটে ধরা পড়ুক আর না পড়ুক —আমাদেরই মারা পড়বার সম্ভাবনা বেশি!

লাটসাহেব তখন মনের রাগ মনেই পুষে নিজের প্রতিজ্ঞাকে বাতিল করতে বাধ্য হলেন। লোলোনেজ কিছুদিন ধরে সমুদ্রের এ বন্দর থেকে ও বন্দরে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে এবং একখানা খুব মূল্যবান জাহাজকেও বন্দি করলে—তার ভিতরে অনেক সোনা-রুপোর তাল ছিল। তারপর রীতিমতো ধনীর মতো সে আবার বোম্বেটে দ্বীপে—অর্থাৎ টর্টুগায় ফিরে এল। সেখানকার বাসিন্দারা মহাসমারোহে তাকে সংবর্ধনা করলে!

লোলোনেজের মাথার ভিতরে তখন এমন এক বিরাট ফন্দির উদয় হয়েছে, এতদিন বোম্বেটে জগতে যা কল্পনাতীত ছিল। বোম্বেটে বলতে বোঝায়, জলপথে যারা ছোটখাট নৌকা বজরা বা বড়জোর জাহাজ লুট করে। সেই লুটের মাল নিয়েই তারা খুশি হয়ে গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু লোলোনেজের উচ্চাকাঙক্ষ এইটুকুতেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারলে না। সে দেখাতে চায়, ইচ্ছা করলে বোম্বেটেরাও কত অসামান্য কাজ করতে পারে!

তার ফন্দি হচ্ছে এই লুটের মাল বেচে এবারে সে অনেকগুলো জাহাজ কিনে প্রকাণ্ড এক নৌবাহিনী গঠন করবে। তার অধীনে বোম্বেটে সৈন্যের সংখ্যা হবে অন্তত পাঁচশত। তারপর সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নানা স্পেনিয় রাজ্যে হানা দিয়ে গ্রাম ও ছোটবড় নগর লুণ্ঠন করবে! তার উচ্চাকাঙক্ষা অত্যন্ত উচ্চ!

স্পেনরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা স্পেনসাম্রাজ্য সেসময়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—ইউরোপের কোনও শক্তিই তার কাছে পাত্ত পেত না!

বোম্বেটে দ্বীপও লোলোনেজের এ অসম্ভব প্রস্তাব শুনে আনন্দে ও উৎসাহে উচ্ছসিত হয়ে উঠল! মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার!

কালাপাহাড়ি কাণ্ড

বোম্বেটে দ্বীপের সমস্ত বোম্বেটের কাছে খবর গেল—স্পেনরাজ্য লুণ্ঠনে মহাবীর লোলোনেজ তোমাদের আহ্বান করছেন!

মড়ার খোঁজ পেলে দলে দলে শকুনি যেমন আকাশ ছেয়ে উড়ে আসে, অ্যাডমিরাল লোলোনেজের কালো পতাকার তরায় চারিদিক থেকেই তেমনি করে ডাকাত, বোম্বেট ও হত্যাকারীর দল ছুটে আসতে লাগল।

এখন, বোম্বেটে দ্বীপে আর একজন মস্ত মাতব্বর ব্যক্তি বাস করে, তার নাম মাইকেল ডি বাস্কো, আপাতত মেজরের পদে অধিষ্ঠিত। ইউরোপের সমুদ্রেও আগে সে বড় একজন বোম্বেটে বলে নাম কিনেছিল। আজকাল অনেক টাকা রোজগার করে বকধার্মিক সেজে পায়ের উপরে পা দিয়ে পরম আরামে বসে বসে খাচ্ছে।

কিন্তু লোলোনেজের বিপুল আয়োজনে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা দেখে সে আবার ভালমানুষের মুখোশ খুলে রাখলে। লোলোনেজের কাছে গিয়ে বাস্কো বললে, অ্যাডমিরাল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমস্ত পথঘাট আমার নখদর্পণে। তুমি যদি আমাকে প্রধান কাপ্তেনের পদ দাও, আমি তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

লোলোনেজ এতবড় একজন জাঁদরেল ও শক্তিশালী লোককে পেয়ে তখনই রাজি হয়ে গেল। বাস্কোকে সে কেবল প্রধান কাপ্তেন নয়, স্থলপথেও নিজের ফৌজের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলে।

এবারে আটখানা জাহাজ ও প্রায় সাতশজন লোক নিয়ে লোলোনেজ স্পানিয়ার্ডদের সর্বনাশ করতে বেরুল। সবচেয়ে বড় জাহাজখানা নিলে নিজে, তার ওপরে ছিল দশটা কামান। হাইতি দ্বীপের উত্তরদিক দিয়ে যেতে যেতে প্রথমেই তাদের নজরে পড়ল একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ। লোলোনেজের নিজের জাহাজেরও চেয়ে সে জাহাজখানা বড়।

সে ইচ্ছা করলেই আটখানা জাহাজ নিয়ে আক্রমণ করে খুব সহজেই জয়লাভ করতে পারত। কিন্তু এখানে সে যথেষ্ট বীরত্ব ও আত্মশক্তির ওপরে নির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখালে। সে কেবল নিজের জাহাজখানাকে রেখে বাকি সাতখানা জাহাজকে সাভোনা দ্বীপের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললে, তারপর শত্রু-তরীর দিকে অগ্রসর হল।

স্পানিয়ার্ডরা বোম্বেটে জাহাজকে আসতে দেখেও ভয় পেলে না। কারণ তাদের জাহাজে ষোলটা কামান ও পঞ্চাশজন সৈনিক ছিল। এই দুঃসাহসই হল তাদের কাল।

যুদ্ধ হল তিন ঘণ্টা ধরে। তারপর স্পানিয়ার্ডদের সমস্ত শক্তি উবে গেল। জাহাজ, ধনরত্ন ও মালপত্তর বোম্বেটেদের হস্তগত হল। বন্দীদের কি দশা হল, প্রকাশ পায়নি। খুব সম্ভব তাদের কারুর কাধের উপরে কেউ আর মাথা বলে কোনও জিনিস দেখতে পায়নি।

অধিকৃত জাহাজখানা নিয়ে লোলেনেজ সানন্দে সাভোনা দ্বীপের দিকে নিজের নৌবাহিনীর খোঁজ করতে গেল। আনন্দের উপরে আনন্দ! সেখানে গিয়ে শোনে, তারাও একখানা ধনরত্নে পরিপূর্ণ জাহাজ হস্তগত করছে। লোলোনেজ বললে, "আমাদের যাত্রা শুভ দেখচি! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

সে আবার বোম্বেটে দ্বীপে ফিরে এল। আগে তাড়াতাড়ি ধনরত্ন, মালপত্তর বিলি করবার ও দ্বীপের লাটকে ঘুষ দেবার ব্যবস্থা করলে। আরও নতুন লোকজন নিলে। তারপর যে শত্রুজাহাজ দখল করেছিল সেখানাকে নিজে নিয়ে আবার সদলবলে যাত্রা শুরু করলে। এবারে তার দৃষ্টি বিখ্যাত মারাকেবো নগরের দিকে।

মারাকেবো হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশের একটি বন্দর নগর। এখান থেকে এখন কফি, চিনি, রবার, কাঠ, চামড়া, নানা ধাতু ও কুইনিন প্রভৃতি চালান দেওয়া হয়। তখনও এ শহরটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়প্রধান স্থান ছিল। এর উত্তরে আছে পচাত্তর মাইল বিস্তৃত ভেনেজুয়েলা উপসাগর ও দক্ষিণে আছে

বৃহৎ মারাকেবো হ্রদ। এর বর্তমান লোকসংখ্যা চুয়াত্তর হাজার, কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন এই শহরের লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল না। লোলোনেজ এই শহরের কাছে এসে নঙ্গর ফেললে। তারপর সদলবলে ডাঙায় গিয়ে নামল। শহরে যাবার পথেই পড়ে এক কেল্লা। তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে সে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু দ্বীপের লোকরাও অপ্রস্তুত ছিল না, লোলোনেজের শনির দৃষ্টি যে তাদের উপরে পড়েছে এ খবর তারা আগেই পেয়েছিল।

বোম্বেটের দল কেল্লার দিকে আসছে শুনে সেখানকার লাট একদল সৈন্যকে জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের উপরে হুকুম রইল, কেল্লার সৈন্যেরা যখন বোম্বেটেদের সমুখ থেকে আক্রমণ করবে, তখন তারা তাদের আক্রমণ করবে পিছনদিক থেকে। দুদিক থেকে আক্রান্ত হলে পর বোম্বেটেদের জনপ্রাণীও আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

বন্দোবস্ত খুব ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোলোনেজও ঘুমিয়ে ছিল না, সব খবরই সে জানতে পেরেছিল যথাসময়ে। সেও নিজের একদল লোককে জঙ্গলের ভিতরে পাঠিয়ে দিলে এবং তারা এমন বিক্রমে ও সবেগে শত্রুদের আক্রমণ করলে যে, একজন স্পানিয়ার্ডও আর কেল্লার ভিতরে ফিরে যেতে পারলে না!

তারপর তারা কেল্লার দিকে অগ্রসর হল। কেল্লার সৈন্যেরা পাচিলের ওপর বড় বড় ষোলটা কামান বসিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

বোম্বেটেরা বার বার কেল্লার দিকে এগিয়ে যায়,কিন্তু ষোলটা তোপের প্রতাপে বারবার ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে তোপও ছিল না, বন্দুকও ছিল না—তাদের সম্বল খালি পিস্তল ও তরবারি! কিন্তু অনেকবার ফিরে আসার পর তারা এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দুর্গ আক্রমণ করলে যে, কামানের গোলা ও বন্দুকের

অগ্নিবৃষ্টিও আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না, প্রাণের সব মায়া ছেড়ে পাচিল টপকে তারা কেল্লার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর দুর্গ এল তাদের দখলে।

ইতিমধ্যে ভগ্নদূত গিয়ে শহরে খবর রটিয়ে দিয়েছে যে, হাজার হাজার বোম্বেটে কেল্লা ফতে করে শহর লুটতে ছুটে আসছে! ভয়ে সে কিছু বাড়িয়েই বললে!

এই মারাকেবো শহর এর আগেও আরও তিন-চারবার শত্রুদের হাতে পড়েছে। সে যে কী বিপদ, কী যন্ত্রণা, কী বিভীষিকা, বাসিন্দারা আজও তা ভুলতে পারেনি। তখনই চারিদিকে রব উঠল—ওই এল রে, ওই এল! পালা! পালা! পালা! টাকাকড়ি ও মালপত্তর নিয়ে সবাই উর্ধ্বশ্বাসে শহর ছেড়ে লম্বা দিলে—কেউ গেল বনের ভিতরে, কেউ গেল জিব্রালটারের দিকে! বলা বাহুল্য, এই জিব্রালটার হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার নতুন শহর। কিন্তু এই নতুন শহরের নামও আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওদিকে দুর্গপ্রাকারের উপর থেকে লোলোনেজ সঙ্কেত করে নিজের নৌ-বাহিনীকে জানিয়ে দিলে—পথ পরিষ্কার, তারা ভিতরে ঢুকে অনায়াসেই শহরের দিকে যাত্রা করতে পারে!

জলপথে মারাকেবো শহর সেখান থেকে আঠার মাইল। বোম্বেটের আগে দুর্গটাকে সমূলে ধ্বংস করলে এবং সেই কাজেই গেল পুরো একটি দিন। তারপর তারা নৌবাহিনী নিয়ে একেবারে শহরের কাছে গিয়ে নঙ্গর ফেললে।

একদল বোম্বেটে সমুদ্র থেকে শহরের উপরে গোলাবর্ষণ করতে লাগল, আর একদল নৌকো বেয়ে তীরে উঠে শহরের ভিতরে সার বেঁধে প্রবেশ করলে। কেউ বাধা দিলে না।

বাধা দেবে কে? সব লোক সে মুল্লুক ছেড়ে পিটটান দিয়েছে! বোম্বেটেরা শহরে ঢুকে দেখলে, চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে! তখন তারা সেখানকার বড় বড় ও

ভাল ভাল বাড়িগুলো দখল করে বসল—তেমন সব বাড়িতে তারা জীবনে কোনওদিন বাস করেনি। বাড়িগুলোর ভিতরে ময়দা, রুটি, শূকর ও মদ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পেলে, কিন্তু ধনরত্ন সব যেন অদৃশ্য হয়েছে ফুসমন্ত্রে! যা পেলে তাই নিয়েই তারা আপাতত আমোদ-আহ্লাদ করতে বসল বটে, তবে তাদের বড় আশায় ছাই পড়ল!

কিন্তু লোলোনেজ হাল ছাড়লে না। সে জনকয়েক বোম্বেটেকে পাঠিয়ে দিলে বনের ভিতরটা আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখতে।

সেই রাত্রেই বোম্বেটেরা বনের ভিতর থেকে বিশজন স্ত্রী-পুরুষ, গাধার পিঠে চাপনে নানারকম মাল ও প্রায় নগদ লক্ষ টাকা নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু একটা এত বড় শহরের পক্ষে লক্ষ টাকা তো তুচ্ছ জিনিস!

লোলোনেজ স্পানিয়ার্ডদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, টাকাকড়ি কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিস?

তারা কোনও সন্ধান দিলে না। তখন তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেওয়া হতে লাগল। তার ফলে কেবল জানা গেল যে টাকাকড়ি সব বনের ভিতরে লুকানো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, সে ঠিকানা পাওয়া গেল না।

লোলোনেজ রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠল। সে হঠাৎ খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একজন স্পানিয়ার্ডকে তখনই কেটে কুচি কুচি করে ফেললে। তারপর চোখ পাকিয়ে বললে, কী! বলবিনি! তাহলে একে একে সকলকেই আমি মোরগের মতো জবাই করব!

এই নরপশুর ভয়ঙ্কর স্বভাব দেখে বন্দীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল! একজন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বনে যারা লুকিয়ে আছে, চলুন তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি!

কিন্তু ডাকাতরা তাদের খুঁজতে আসছে, বনবাসী নাগরিকরাসে খবর পেয়েই উর্ধ্বশ্বাসে আবার নতুন এক জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দিলে। বোম্বেটেরা কারুর টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলে না।

নিরুপায় হয়ে বোম্বেটেরা দিন পনের সেই শহরেই বাস করলে।

তারপর লোলোনেজ বললে, বন্ধুগণ, এই শহরের ধড়িবাজ লোকগুলো আমাদের কলা দেখাতে চায়! এখানে অনেক খাবারদাবার আছে বটে, কিন্তু খাবার খেতে আমরা এখানে আসিনি। এখানকার ধনরত্ন ওরা সব জিব্রালটারে নিয়ে গেছে—চলো, আমরা জিব্রালটার আক্রমণ করিগে!

তার অভিপ্রায় হওয়ার আগেই জিব্রালটারে গিয়ে পৌছল! সবাই আবার সে শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় পালাবার জোগাড় করলে।

কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা বললেন, তোমাদের কোনও ভয় নেই। আসুক না বোম্বেটেরা–এখানে এলে বাছারা মজাটা টের পাবেন! আমি তাদের সমূলে বিনাশ করব!

শাসনকর্তা ছিলেন একজন পাকা যোদ্ধা, তিনি ইউরোপে অনেক লড়াই করেছেন। তিনি তখনই অসংখ্য কামান ও আটশজন সৈন্য নিয়ে বোম্বেটেদের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে লাগলেন। সমুদ্রের দিকে কুড়িটি কামান বসানো হল। আর একদিকে বসানো হল আটটা বড় বড় কামান। শহরে যাবার একটি রাস্তা খুব শক্ত বেড়া দিয়ে বন্ধ করা হল। আর একটা রাস্তা খুলে রাখা হল—তাতে এমন পুরু পাক ও কাদা ছিল যে, সেখান দিয়ে পথ-চলাচল করা প্রায় অসম্ভব। সে পথে যারা আসবে সৈন্যদের অগ্নিবৃষ্টিতে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়।

বোম্বেটেরা যথাসময়ে নগর থেকে খানিক তফাতে এসে দেখলে, শহরের উপরে স্পেনরাজের পতাকা উড়ছে সগর্বে এবং স্পানিয়ার্ডরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এরা যে যুদ্ধের জন্যে এমন বিপুল আয়োজন

করবে, লোলোনেজ তা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু এজন্যে সে ভীত হল না, দলের মাথাওয়ালা লোকদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল। পরামর্শ হচ্ছে এই যে, স্পানিয়ার্ডরা যখন উচিতমতো আত্মরক্ষা করবার জন্যে এত বেশি সময় পেয়েছে এবং তাদের সৈন্যসংখ্যাও যখন এমন অসামান্য, তখন তাদের আর আক্রমণ করা উচিত কিনা! লোলোনেজ বললে, "কিন্তু তবু আমি হতাশ হবার কারণ দেখি না। তোমরা অনায়াসেই বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারো! বীরপুরুষের মতো আত্মরক্ষা করবার শক্তি আমাদের আছে। আমি তোমাদের সর্দার, আমি যা বলি তাই করো। এর আগেও আজকের চেয়ে কম লোক নিয়ে আমরা এর চেয়েও বড় বিপদকে এড়াতে পেরেছি। শত্রুরা দলে যত ভারি হবে, আমাদের গৌরবও তত বাড়বে!"

বোম্বেটেদের ধারণা ছিল যে মারাকেবোর সমস্ত ধনরত্নই এইখানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব তারা একবাক্যে বললে, "সর্দার, তুমি যা বলবে আমরা তাই করব! তুমি যেখানে যাবে আমরা সেইখানেই যাব!

লোলোনেজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, সাবাস! কিন্তু শুনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যে কেউ একটু ভয় পাবে, আমি তাকেই নিজের হাতে গুলি করে মেরে ফেলব!

প্রায় চারশ বোম্বেটে যুদ্ধের আগে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলে—সে দিন যে কার জীবনের শেষদিন, তা কে জানে?

লোলোনেজ সকলকার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেতার স্থান অধিকার করলে। তারপর শূন্যে তরবারি তুলে দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "ভাই সব! এসো আমার সঙ্গে—'মাভৈঃ!' সকলে তার অনুসরণ করলে।

প্রথম পথে গিয়ে তারা দেখলে, তা এমন ভাবে বন্ধ যে এগুবার কোনও উপায় নেই। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে পাক ও কাদাভরা পথ-সেটা স্পানিয়ার্ডদের ফাঁদ! তারা বনজঙ্গল থেকে ডালপালা-পাতা কেটে এনে পথের ওপরে পুরু করে ছড়িয়ে

দিতে লাগল—যাতে করে পাকে-কাদায় পা বসে যাবে না। ইতিমধ্যে স্পানিয়ার্ডদের কামান ও বন্দুক এমন ভীষণ গর্জন করতে লাগল যে, বোম্বেটেরা পরস্পরের গলার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেলে না! কিন্তু সেই ভয়াবহ গুলিগোলা বৃষ্টির ভিতর দিয়েও তারা নির্ভয়ে ও অটল পদে সমান অগ্রসর হতে লাগল।

অবশেষে তারা শুকনো মাঠের উপরে এসে পড়ল। এখানে আরও ছয়টা বড় বড় নতুন কামান অগ্নি উদগার করতে আরম্ভ করলে! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অমাবস্যার চেয়ে অন্ধকার! তার উপরে শত্রুরা আবার দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সবেগে তাদের আক্রমণ করলে! সে এমন প্রবল আক্রমণ যে, বোম্বেটেরা পিছু না হটে পারলে না! তাদের দলের অনেক লোক হত ও আহত হয়ে রক্তাক্ত মাটির উপরে লুটোতে লাগল।

বোম্বেটেরা বনের ভিতর অন্য কোনও নতুন রাস্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করলে--কিন্তু রাস্তা কোথাও নেই! শত্রুরা আর কেল্লা ছেড়ে বেরুবার নামও করলে না—কিন্তু আড়াল থেকে সমান গোলাগুলি চালাতে লাগল।

লোলোনেজ তখন ভেবে চিন্তে পৃথিবীতে সব দেশেই সুপরিচিত একটি পুরনো উপায় অবলম্বন করলে—সকলকেই দিলে হঠাৎ একসঙ্গে পালিয়ে যেতে হুকুম!

তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখে স্পানিয়ার্ডরা মহা উৎসাহে বলে উঠল—ওরা পালাচ্ছে! ওরা পালাচ্ছে! এসো, পিছনে পিছনে গিয়ে ওদের আমরা বধ করি!—তারা সার ভেঙে বিশৃঙ্খল হয়ে বোম্বেটেদের পিছনে পিছনে তেড়ে এল।

স্পানিয়ার্ডরা যখন অতিরিক্ত উৎসাহের ঝোকে কামানের গোলার সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে—বোম্বেটেরা তখন সর্দারের হুকুমে আচম্বিতে আবার ফিরে দাঁড়াল এবং প্রচণ্ডবিক্রমে শত্রুদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল! বিষম হাতাহাতি লড়াই শুরু হল।

খানিক পরে দেখা গেল, দু'শ স্পানিয়ার্ডের দেহ পৃথিবীকে বুকের রক্তে রাঙা করে ছেয়ে আছে এবং বাকি সবাই কেল্লার দিকে আসতে না পেরে বনের দিকে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করছে!

কেল্লার স্পানিয়ার্ডরা তাই দেখে হতাশ ভাবে কামান ছোড়া বন্ধ করে বলে উঠল-- আমরা আত্মসমর্পণ করছি। আমাদের বধ কোরো না।

কেল্লার উপর থেকে তখনই স্পেনের রাজপতাকা নামিয়ে ফেলা হল—সেখানে উড়তে থাকল বোম্বেটেদের পতাকা! কেল্লা ফতে! শহর তাদের হাতের মুঠোয়!

কিন্তু সাবধানের মার নেই—বলা তো যায় না, বনের পলাতক শত্রুরা আবার যদি সাহস সঞ্চয় করে ফিরে আসে! বোম্বেটেরা কেল্লার কামানগুলো আবার নিজেদের সুবিধামতো সাজিয়ে রাখলে।

মিথ্যা ভয়! রাত্রি প্রভাত, যারা পালিয়েছে তারা আর ফিরল না।

তখন হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল, শত্রুদের মৃতদেহের সংখ্যা পাঁচশত। শহরের ভিতরে আহত লোকও অসংখ্য এবং তাদের ভিতরেও অনেকে মারা পড়ছে ও মারা পড়বে। বন্দি শত্রুর সংখ্যা একশ পঞ্চাশ ও ক্রীতদাসেরা গুণতিতে পাঁচশত।

বোম্বেটেদের লোক মরেছে মাত্র চল্লিশ জন এবং জখম হয়েছে চল্লিশ জন—যদিও ক্ষত বিষিয়ে আহতদেরও অধিকাংশই মারা পড়ল।

বোম্বেটেরা শত্রুদের মৃতদেহ নিয়ে দুখানা নৌকো বোঝাই করলে, তারপর সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে নৌকো দুখানা ডুবিয়ে দিলে।

তারপর আরম্ভ হল লুট! সোনার তাল, রুপের তাল, হীরে-মুক্তো, ভাল ভাল দামী আসবাব ও নানারকম মাল-শহরের কোথাও আর কিছু বাকি রইল না! কিন্তু লোভ এমনই জিনিস, সারা শহর লুটেও বোম্বেটোদের আশ মিটাল না,

তাদের সন্দেহ হল আরও অনেক ধনরত্ন লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। সুদীর্ঘ আঠার দিন ধরে চলল অবাধে এই পরস্বপহরণের বীভৎস পালা!

এরই মধ্যে বন্দি স্পানিয়ার্ডদের অধিকাংশই ইহলোক ত্যাগ করলে- অনাহারে! শহরে খাবার জিনিস-বিশেষ করে তাদের প্রধান আহার্য মাংসের যারপরনাই অভাব! যা ছিল তা বোম্বোেটদেরই পক্ষে অপ্রচুর। তা থেকে বন্দীদের ভাগ কেউ দিলে না। বন্দীদের খেতে দেওয়া হত খচ্চর ও গাধার মাংস। অনেকে তা মুখেই তুলতে পারত না, ক্ষিধের চাে‌টে যারা তাও খেতে বাধ্য হত, অনভ্যাসের দরুন তারা পেটের অসুখে ভুগে ভবলীলা সাঙ্গ করলে। অনেক বন্দীকে গুপ্তধন দেখিয়ে দেবার জন্যে এমন দুঃসহ ও পাশবিক যন্ত্রণা দেওয়া হল যে, সইতে না পেরে তারাও পরলোকে প্রস্থান করলে।

অল্প যে কয়েকজন বেঁচে ছিল, লোলোনেজ তাদের ডেকে বললে, তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা বনের ভিতর গিয়ে তোমাদের সঙ্গীদের বলগে যাও যে, আমাকে আরও অনেক টাকা না দিলে আমি এই শহরে আগুন ধরিয়ে দেব। যাও, দুদিন সময় দিলুম।

দুদিন কেটে গেল। বোম্বেটেরা তখন শহরে আগুন ধরাতে আরম্ভ করলে। স্পানিয়ার্ডরা দূর থেকে তাই দেখতে পেয়ে তখনই দূত পাঠিয়ে দিলে। সে এসে জানালে,—টীকা এখনই নিয়ে আসা হবে, দয়া করে আপনারা আগুন নিবিয়ে দিন!

বোম্বেটেরা রাজি হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে শহরের এক অংশ পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে!

তারপর তাদের টাকা এল। তবু চার হাপ্ত সেই শহরে দৈত্যলীলা করে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে তারা আবার জাহাজে গিয়ে উঠল।

আবার তারা মারাকেবো শহরে এসে হাজির! পাপ বিদায় হয়েছে ভেবে যারা ভরসা করে শহরে ফিরে এসেছিল, তারা ফের পালাতে লাগিল!

বোম্বেটেরা তাদের খবর পাঠিয়ে দিলে যে, হয় আমাদের ধনরত্ন দিয়ে খুশি কর, নয় আমরা সারা শহর আবার লুট করে আগুন ধরিয়ে দেব!

অনেক টাকা পাঠিয়ে মারাকেবোর অধিবাসীরা এই আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারলাভ করলে। বিজয়গর্বে ফুলে উঠে লোলোনেজ আবার বোম্বেটে দ্বীপে ফিরে এল। তাদের অপূর্ব সৌভাগ্যের কাহিনী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল-যারা তার সঙ্গী হয়নি তারা অনুতাপে হাহাকার করতে লাগল।

লোলোনেজ দলের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অংশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিলে-প্রত্যেকেরই রোগা পকেট মোটা হয়ে ফুলে উঠল। কিন্তু তারা এমনই লক্ষ্মীছাড়া যে, জুয়া খেলে আর মদ খেয়ে দুহাতে টাকা ওড়াতে লাগল। সে পাপের ধন আর বেশিদিন রইল না—অল্পদিন পরেই তারা যে গরিব ছিল সেই গরিবই হয়ে পড়ল। তখন তারা আবার নতুন শিকারের খোজে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করতে লাগল!

সবাই বলে, সর্দার! আবার সাগরে জাহাজ ভাসাও!

সর্দার বলে, তথাস্তু!

মহাবিচারকের বিচার

বোম্বেটে দ্বীপে যদি ভাল গণৎকার থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সে বলত, লোলোনেজ, সাবধান! এবারের যাত্রা শুভ নয়!

কিন্তু সে কথা সে কানে তুলত কিনা, সন্দেহ! নিয়তির সূত্র তাকে বাইরে টানছে। সে অনেক পাপ করেছে, এবারে প্রতিক্রিয়ার সময় এসেছে!

ভবিষ্যৎ ভাববার সময় তার ছিল না, বর্তমানের ঔজ্জ্বল্যে সে অন্ধ! বোম্বেটে দ্বীপে তার চেয়ে বড় নাম আজ আর কারুর নেই-সবাই তাকে ভয় করে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে, যেন সে নরদেবতা! যেমন তার শক্তি, তেমনই ঐশ্বর্য্য!

কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে স্থির থাকতে দিলে না। তাই আবার সে যেদিন সমুদ্রযাত্রা করবে বললে, সেদিন সারা দেশে আনন্দ ও উৎসাহের বন্যা বইল! এবারে আর লোকজনের জন্যে তাকে একটুও মাথা ঘামাতে হল না, লোলোনেজের সঙ্গী হয়ে বিপদে পড়তেও লোকের এত আগ্রহ যে, তার দরজার সামনে উমেদার আর ধরে না। যত লোক সে চায়, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক এসে তার কাছে ধর্না দিয়ে পড়ল।

লোলেনেজ নতুন করে ছয়খানা জাহাজ সাজালে। এবারে তার সঙ্গীর সংখ্যা হল সাতশত, এর মধ্যে তিনশজন আগের বারেও তার সঙ্গে গিয়েছিল।

লোলোনেজ বললে, এবারে আমি নিকারাগুয়া জয় করতে যাব।

আবার সমুদ্র। বাংলায় সমুদ্রের আর এক নাম 'রত্নাকর' এবং এই বোম্বেটোদের পক্ষে সমুদ্র রত্নাকরাই বটে।

কিন্তু এবারে রত্নের এখনও দেখা নেই! তার উপরে অনুকূল বায়ুর অভাব, বোম্বোটদের জাহাজগুলো যেন অগ্রসর হতেই নারাজ! এইভাবে কিছুদিন কটবার পরেই খাদ্যাভাব উপস্থিত হল। তখন বাধ্য হয়েই বোম্বেটের প্রথম যে বন্দর দেখতে পেলে সেইখানেই জাহাজনঙ্গর করলে। সমুদ্র থেকে একটা নদী ডাঙার

মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, নাম তার জাগুয়া। তার তীরে তীরে অসভ্য ও দরিদ্র লাল মানুষ বা রেড ইন্ডিয়ানের বাস। বোম্বেটেরা নী েকোয় চড়ে সেই নদীর ভিতরে গেল এবং রেড ইন্ডিয়ান বেচারাদের পালিত পশু ও অন্যান্য মালপত্তর নিঃশেষে কেড়ে নিলে-নিজেদের খাদ্যভাব দূর করবার জন্যে।

কেবল তাইতেই খুশি হল না। তারা স্থির করলে, যতদিন না অনুকূল বাতাস বয় ততদিন তারা আর বাহির সমুদ্রে যাবে না, এই দেশের যত শহর আর গ্রাম লুট করে সময় কাটাবে আর পকেট পূর্ণ করবে।

তারা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর লুট করতে করতে পুয়ের্টে কাভাল্যো (মূল গ্রন্থের এই নামটি সম্ভবত ভুল। মধ্য আমেরিকার সমুদ্র উপকূলে পুয়ের্টে কাভালো নামে কোনও বন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় না! দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা প্রদেশের সমুদ্র উপকূলে ওই নামের একটা সমৃদ্ধিশালী বন্দর আছে। কিন্তু লোলোনেজ এবার এ অঞ্চলে আসেনি। খুব সম্ভব, সে হণ্ডুরাস উপসাগরের মুখে পুয়ো ের্ট কার্টজ বন্দরে বাহিনী রেখে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। কার্টজ বন্দর থেকে প্রায় ৩৬ মাইল ভিতর দিকে সান পেড্রো বা সেন্ট পিটার শহর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের পুস্তকের মানচিত্রে অনবধানত বশত কার্টজ বন্দর ও সেন্ট পিটার শহর দেখানো হয়নি। Everyman Encyclopaedia- World Atlas ভলুমের ১৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।) নামে এক বন্দরে এসে হাজির হল। সেখানে স্পানিয়ার্ডদের একটা আস্তানা ও একখানা বড় জাহাজ তিতার তৎক্ষণাৎ জাহাজখন দখল করে স্পা িনয়ার্ডদের আস্তান ঘটে আগুন জ্বলিয়ে এর মধ্যে তারা কত লোককে বন্দি করেছে, কত বন্দীকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছে ও কত বন্দীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, তার আর সংখ্যা হয় না। লোলোনেজের প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর! কারুর জিভ সে নিজের হাতে টেনে বার করে ফেলে, কারুকে বা স্বহস্তে কেটে খণ্ড খণ্ড করে! যেখা েন দিয়ে তার দল পথ চলে সেখানটাই যেন ধুধু শ্মশান হয়ে যায়! যেন সে নরদেহে প্রলয়কর্তা,

যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করাই তার একমাত্র কর্তব্য! স্পানিয়ার্ডদের কাছে সে যেন সাক্ষাৎ যম!

লোলোনেজের সঙ্গে আছে এখন তিনশ বোম্বেটে,-বাকি লোকজন ও জাহাজগুলি সে তার সহকারী মোসেস ফ্যান ফিন নামে এক ওলন্দাজের তত্ত্বাবধানে সমুদ্র উপকূলে রেখে এসেছে। প্রায় ছত্রিশ মাইল পথ হেঁটে লোলেনেজী সান পেড্রো বা সেন্ট পিটার শহরের কাছাকাছি একটা বনের ধারে এসে পড়ল।

তার অত্যাচারে পাগলের মতো হয়ে স্পানিয়ার্ডরা বনের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। বোম্বোটদের দেখেই তারা গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করলে। এখানে রীতিমতো একটা লড়াই হয়ে গেল এবং দুই পক্ষেই অনেক লোক হত ও আহত হল। তারপর স্পানিয়ার্ডরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। শত্রুদের যারা জখম হয়েছিল তাদের কারুর উপরেই বোম্বেটেরা দয়া করলে না-একে একে সবাইকে পরলোকের পথে পাঠিয়ে দিলে।

যারা বন্দি হল তাদের ডেকে লোলোনেজ বললে, এই বনের ভেতর দিয়ে শহরে যাবার আর কোনও ভাল। রাস্তা আছে?

তারা বললে, না।

লোলোনেজ আবার গর্জন করে বললে, ভাল চাস তো এখনও বল!

লোলোনেজের মগজে শয়তান জেগে উঠল। সামনেই যে স্পানিয়ার্ড দাঁড়িয়েছিল, ঘাড় ধরে তাকে কাছে টেনে আনলে-যেন সে তারই মতো মানুষ নয়, তুচ্ছ একটা বলির পশু মাত্র! ফস করে খাপ থেকে চকচকে তলোয়ারখানা বার করে ফেললে এবং সেই হতভাগ্য স্পানিয়ার্ডের বুকের ভিতরে তরোয়ালের ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে মস্ত একটা ছিদ্রের সৃষ্টি করলে-তার মর্মভেদী আর্তনাদে কিছুমাত্র কান না পেতেই! তারপর সেই তখনও জীবন্ত দেহের ছ্যাঁদা করা বুকের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলে এবং তার নৃত্যশীল, তপ্ত ও রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা

সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মুখে পুরে পরম উপাদেয় খাদ্যের মতো কচমচ করে চিবোতে চিবোতে বললে, "বল কোথায় রাস্তা আছে? নইলে তোদের হৃৎপিণ্ডও আমার খাবার হবে!

গল্পের রাক্ষস কি আজ মানুষ মূর্তিতে সমুখে দেখা দিয়েছে? না এ ভূত-প্রেত, পিশাচ? বন্দীদের হৃৎপিণ্ডও যেন মহা আতঙ্কে বুকের ভিতরেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শিউরোতে শিউরোতে তারা প্রায় রুদ্ধস্বরে বললে,--আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি!

রক্তমাখা ওষ্ঠাধর ফাঁক করে হা হা হা হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে লোলোনেজ বললে, পথে এসো বাবা, পথে এসো! কোথায় পথ?

কিন্তু কোথায় পথ? গভীর অরণ্য, গাছের পর গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পায়ের তলায় কাঁটা ঝোপ আর জঙ্গল,—অজগর সাপ ও জাগুয়ার বাঘ ছাড়া সেখান দিয়ে আর কেউ আনাগোনা করে না। বন্দীরা ভয়ে ভেবড়েই পথের নাম মুখে এনেছিল, আসলে সেখানে কোনও পথ ছিল না!

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে লোলোনেজ বললে, 'পথ নেই? আচ্ছা স্পানিয়ার্ড কুত্তারাই এজন্যে শাস্তিভোগ করবে!' লোলোনেজের শাস্তি-না জানি সে কী ভয়ানক!

এদিকে ও অঞ্চলের স্পানিয়ার্ডরা বুঝলে, এই দুর্ধর্ষ ও পাপিষ্ঠ বোম্বোটেদের জব্দ ও কাহিল করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, বনের ভিতরে অতর্কিতে বার বার আক্রমণ করা! এমনই বারংবার আক্রমণের ফলে বোম্বেটের সত্যসত্যই মহা জ্বালাতন হয়ে উঠল এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসতে লাগিল! কিন্তু বাঁধা পেয়েও শেষপর্যন্ত তারা সেন্ট পিটার শহরের কাছাকাছি এসে পড়ল।

এবার বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হল। এ যুদ্ধে স্পানিয়ার্ডরা বড় বড় কামানও ব্যবহার করতে ছাড়লে না। কিন্তু যেই তারা কামান ছেড়ে, লোলোনেজের আদেশে

বোম্বেটের অমনি মাটির উপরে শুয়ে পড়ে, তারপর গোলাগুলো তাদের পর হয়ে শূন্য দিয়ে চলে গেলেই, তারা চোখের নিমেষে উঠে পড়ে শহরের দিকে এগিয়ে যায় এবং হাই হই রবে বোমার পর বোমা ছুড়তে থাকে! বোমা ছুড়ে বহু শত্রু নিপাত করেও একবার স্পানিয়ার্ডদের প্রবল আক্রমণে চাোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে বোম্বেটেরা উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এল। কিন্তু লোলোনেজের দৃপ্ত বাক্যে উত্তেজিত হয়ে আবার তারা ফিরে দাঁড়িয়ে তেড়ে গেল! তখন স্পানিয়ার্ডদের সব সাহস ও শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। সাদা নিশান হাতে করে শত্রুদূত এসে জানালে, "আমরা শহরের ফটক খুলে দিচ্ছি-কিন্তু এই শর্তে যে, দুঘন্টার ভিতরে আমাদের উপরে কেউ কাোনও অত্যাচার করতে পারবে না।

আর বেশি লোকক্ষয় করতে না চেয়ে লোলোনেজ এই শর্তেই রাজি হয়ে গেল। শহরের ফটক খুলল। বোম্বেটেরা সার বেঁধে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

লোলোনেজ আজ একটু ভদ্রতার পরিচয় দিলে। ঠিক দুটি ঘণ্টা সে লক্ষ্মীছেলের মতো হাত গুটিয়ে চুপটি করে বসে রইল। শত্রুরা দামী জিনিসপত্তর নিয়ে দলে দলে সরে পড়ছে দেখেও নিজের শয়তানীকে সে চেপে রাখলে! হঠাৎ তার এ সাধুতা, এ দুর্বলতা কেন? এ অনুতাপ কি অন্মিমকালের হরিনামের মতো?

ঠিক দুঘণ্টার জন্যে সৎপ্রবৃত্তির আনন্দ উপভোগ করে কুম্ভকর্ণ আবার ভীম হুঙ্কারে জেগে উঠল—'লুট করো! বন্দি করো! হত্যা করো! দুঘণ্টা কাবার!' যারা তখনও পালাতে পারেনি তারা এবং শহরে তখনও যা অবশিষ্ট ছিল সমস্তই বোম্বেটোদের হস্তগত হল। কিন্তু সে এমন বেশিকিছু নয়! স্পানিয়ার্ডরা সন্ধির দুঘণ্টার রীতিমতো সদ্ব্যবহার করেছে।

বোম্বেটের দিনকয় নগরেই বাস করলে, এবং এ কয়দিন তাদের স্বভাবগত নিষ্ঠুরতার, কদর্যতার ও ভীষণতার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করলে না। এখান থেকে যাত্রা করবার দিনে তারা শহরেও আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল।

সেই সাঙ্ঘাতিক দেওয়ালি উৎসব শেষ হলে পর দেখা গেল, আগে যেখানে শহর ছিল এখন সেখানে পড়ে রয়েছে শুধু বিরাট একটা ভস্মের পাহাড়!

সেন্ট পিটার শহর ধ্বংস করে লোলোনেজ খোশমেজাজে সমুদ্রতীরে ফিরে এল। তার দলের যে সব লোক জাহাজ ও নৌকা নিয়ে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

দু'একদিন পরে গুয়াটেমালা নদীর মোহানায় এসে বোম্বেটেরা খবর পেলে যে, স্পানিয়ার্ডদের একখানা জাহাজ সেখানে এসে উপস্থিত হবে। তারা সেই জাহাজের অপেক্ষায় দলে দলে সেখানে পাহারা দিতে লাগল। কোনও দল সাগরের বুকে ছোট ছোট দ্বীপে কাছিম ধরতে গেল। কোনও দল গেল। সেখানকার রেড ইন্ডিয়ান ধীবরদের উপরে অত্যাচার করতে।

সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরা তখন একশ বছর ধরে স্পানিয়ার্ডদের অধীনে বাস করে আসছে। স্পানিয়ার্ডদের চাকর বাকর দরকার হলে তারাই এসে কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। স্পানিয়ার্ডরা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল।

কিছুকাল তারা খ্রিস্টধর্মের নিয়ম পালন করে। কিন্তু স্পানিয়ার্ড প্রভুদের অধ্যামিকের মতো ব্যবহার ও হিংস্র আর পশু প্রকৃতি দেখে খ্রিস্টধর্মে বোধহয় তাদের ভক্তি চটে যায়। তখন আবার তারা পিতৃ-পিতামহের ধর্মকে ফিরে ফিরতি গ্রহণ করে।

হিন্দুদের নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে। কিন্তু তাদের দেবতাদের 'সেনসাস' কখনও নেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে রেড ইন্ডিয়ান দেবতারাও দলে খুব হালকা হবেন বলে মনে হয় না। কেননা তাদের ঘরে ঘরে নূতন নূতন দেবতার রকম-বেরকম লীলাখেলা দেখা যায়।

তাদের দেবতা নির্বাচনের একটা পদ্ধতির কথা বলি। পরিবারের মধ্যে যে মুহূর্তে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, তারা তখনই তাকে নিয়ে বনের ভিতরে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

মেঝের উপরে মণ্ডলাকারে খানিকটা জায়গা খুঁড়ে তার মধ্যে পুরু করে ছাই বিছিয়ে দেয়। তারপরে সেই ছাইয়ের উপরে নবজাত শিশুকে শুইয়ে রেখে চলে আসে। মন্দিরের চারিদিকের সব দরজা খোলা থাকে। তার কাছে আর জনপ্রাণীও যায় না। যে কোনও হিংস্র জন্তু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু কোনও মানুষ আসবার হুকুম নেই। সারারাত এই ভাবে কেটে যায়!

সকালে শিশুর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা আবার মন্দিরের ভিতরে আসে। অনেক সময়ে দেখা যায়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বা অন্য কারণে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, জীবন্ত ও অক্ষত শিশুকে। তখন সকলে ছাঁইয়ের উপরে কোনও জন্তুর পদচিহ্ন আছে কিনা পরীক্ষা করে। পদচিহ্ন যদি না থাকে, তবে সেই শিশুকে আবার সেখানে একলা রূপান্ত হয়। আর পহি দি থাকে।তবে পরখ কেরখেছি সেগুলাে কাে‍ন জন্তুর পদচিহ্ন।

যে জন্তুর পদচিহ্ন সেখানে থাকবে, সেই জন্তুই হবে শিশুর দেবতা,-তার সারা জীবনের উপাস্য!

এখন আবার বোম্বেটেরা কি করছে দেখা যাক। প্রায় তিনমাস পরে খবর এসেছে, স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ বন্দরে দেখা দিয়েছে। সবাই সেইদিকে ছুটল।

বড় যে সে জাহাজ নয়, প্রকাণ্ড আকার, উপরে অনেক সৈন্যসামন্ত, বিয়াল্লিশটা কামান! কিন্তু এ সবের দিকে লোলোনেজ একটুও ভ্রুক্ষেপ করলে না, সে ভয়ের ধার ধারে না। বোম্বেটেরা একজোট হয়ে জাহাজখানাকে আক্রমণ করলে এবং জাহাজের একশ ত্রিশজন সৈন্যও তাদের বাধা দেবার জন্যে কম চেষ্টা করলে না, তবু শেষকালে জিত হল বোম্বোটেদেরই। কিন্তু এত পরিশ্রম ও

লোকক্ষয়ের পরে জাহাজ দখল করেও বোম্বেটেরা হতাশ হয়ে পড়ল। তার ভিতরে লুট করবার মতো বিশেষ কিছুই নেই।

লোলোনেজ তখন পরামর্শসভা আহ্বান করলে। সে বললে, এইবারে আমি গুয়াটেমালার দিকে যেতে চাই। তোমাদের মত কি?

অনেকেই বললে, আমরা এইবার এ দেশ ছেড়ে ফিরে যেতে চাই।

লোলোনেজ বললে, কিন্তু আমি ফিরব না।

যারা এ কথা বললে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে নূতন লোক-লোলোনেজের পূর্ব অভিযানে তারা তার সঙ্গে ছিল না। গত অভিযানের ফল দেখে তারা ভেবেছিল বোম্বেটের জীবন হচ্ছে অত্যন্ত রঙিন, গাছ নাড়া দিলে যেমন ফল ঝরে, রাশি রাশি মোহর ঝরাও বুঝি তেমনই সহজ! কিন্তু তাদের লাখ টাকার স্বপ্নঘোর আজ ছুটে গেছে।

তারা দলে রইল না। লোলোনেজের দলকে একেবারে হালকা করে দিয়ে বেশিরভাগ বোম্বেটেই কয়েকখানা জাহাজ নিয়ে সরে পড়ল। বনে বনে কাঁটাঝোপে ঘুরে, অনাহারে অল্পাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পেয়ে ও স্পানিয়ার্ডদের গরম গরম গুলি খেয়ে খেয়ে তাদের শখ ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল!

দল খুব ছোট হয়ে গেল, অন্য কেউ হলে এখানে আর থাকত না, কিন্তু একগুঁয়ে লোলোনেজ গ্রাহ্যও করলেন না। সিংহের মতন তার মেজাজ-নিষ্ঠুর, গর্বিত, অদম্য! সমুদ্রের কিনারে কিনারে বনের ভিতর দিয়ে বোম্বেটের দল চলেছে। খাদ্যাভাব হওয়াতে তারা বানর মেরে তারই মাংস ভক্ষণ করতে লাগিল—তবু অজানার নেশায় পথচলা তাদের থামলনা। কিন্তু তখনও লোলোনেজ আন্দাজ করতে পারেনি, তার পাপের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছে!

যেখানে দিয়ে তারা যাচ্ছে সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানরাও যে শান্ত ছেলে নয়, একদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আগেই বলেছি, বোম্বেটেরা রেড

ইন্ডিয়ানদেরও ওপরে কম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি, সুতরাং তারাও তাদের বাগে পেলে ছেড়ে কথা কয় না।

বোম্বোটেদের দলে একজন ফরাসি ও একজন স্পানিয়ার্ড ছিল। একদিন তারা দলছাড়া হয়ে খাদ্য বা অন্য কিছুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, একদল সশস্ত্র রেড ইন্ডিয়ান তাদের দিকে ছুটে আসছে!

ছুটে কাছে এসে তারা যে আদর করে তাদের কোলে টেনে নেবে না, বোম্বেটেরা এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। তারাও তারোয়াল বার করলে, কিন্তু দুখানা তরবারি দ্বারা এত লোককে ঠেকানো সোজা কথা নয়। তখন তারা পদযুগলের ওপরে নির্ভর করাই উচিত মনে করলে। ফরাসি বোম্বেটের পদযুগল এমন সুপটু ছিল যে, তীরের মতন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু স্পানিয়ার্ড ভায়া পায়ের কাজ ভাল করে শেখেনি, রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে ধরে ফেললে।

দু'চারদিন পরে অন্যান্য বোম্বোেটেদের সঙ্গে সেই ফরাসি আবার সঙ্গীর খোঁজে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।

দেখা গেল, সেখানে একটা অগ্নিকুণ্ড রয়েছে, কিন্তু তার ভেতরে আগুন নেই। খানিক তফাতে পড়ে রয়েছে কতকগুলো হাড়। বোম্বেটেরা আন্দাজ করলে, স্পার্নিয়ার্ড ভায়ার দেহে 'রোস্ট" বানিয়ে রেড-ইন্ডিয়ানরা উদর পরিতৃপ্ত করেছে! অবশ্য এ অনুমান ভুল হতে পারে। কিন্তু স্পানিয়ার্ডকে আর পাওয়া যায়নি।

এদিকে লোলোনেজের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে দেখুন। দলের অনেকে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। বিপদের ওপর বিপদ! রেড ইন্ডিয়ানরা স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পিছনে লেগেছে। বোম্বেন্টেদের তারা বুঝেছে। এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটেগুলো হচ্ছে, কলেরা বসন্ত ও প্লেগের মতো সমস্ত মানুষ জাতেরই শত্রু! এদের উচ্ছেদ না করতে পারলে শান্তি নেই!

দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে লড়ে লড়ে বোম্বোটেদের অধিকাংশই মারা পড়ল। তবু লোলোনেজ ফেরবার নাম মুখে আনে না!

কিন্তু শেষটা ফিরতে হল। এবার ফিরে লোলোনেজ তার সত্যিকার স্বদেশে গেল-অর্থাৎ নরকে; এবং সেই মহাপ্রস্থানের দৃশ্য লোলোনেজেরই উপযোগী।

ডেরিয়েন প্রদেশের রেড ইন্ডিয়ানরা একদিন বোম্বোেটদের ক্ষুদ্র দলকে আক্রমণ করলে। তাদের বেশির ভাগ মারা পড়ল, কতক পালাল, কতক বন্দি হল। বন্দীদের ভিতরে ছিল লোলোনেজ স্বয়ং হাজার হাজার বীর রক্তে যার হাত এখনও ভিয়ে আছে। সেই লোলোনেজ আজ বন্দী!

এমন বন্দীকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়, রেড ইন্ডিয়ানরা তাই করলে। তারা আগে লোলোনেজকে একটা গাছের গুড়িতে বাঁধলে। তারপর তার সমুখে বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বাললে। কেউ হয়তো জীবন্ত লোলোনেজের নাক কেটে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলে। কেউ কেটে নিলে কান। কেউ কাটলে জিভ। কেউ কাটলে হাত এবং কেউ বা পা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তার ভয়াবহ মৃত্যু ঘটল। তার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, রেড ইন্ডিয়ানরা তখন সেই ছাইগুলো নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে-যাতে এই অমানুষিক মানুষের কোনও ঘূর্ণিত স্মৃতিই পৃথিবীকে আর কলঙ্কিত না করতে পারে!

তার পাপসঙ্গীদেরও ওই দুর্দশই হল। কেবল একজন অনেক সাধ্যসাধনার পর কোন গতিকে শেষটা মুক্তি পেয়েছিল; বোম্বোটদের এই শোচনীয় পরিণামের কথা প্রকাশ পায় তার মুখেই।

লোলোনেজের পরিণামই আভাস দেয় যে, জীবের শিয়রে হয়তো সত্যই কোনও অদৃশ্য মহাবিচারকের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ হয়ে আছে!

এ অঞ্চলের জানোয়ার

যে মুল্লুকের মানুষ-জানোয়ারের কথা নিয়ে এত আলোচনা করছি, সেখানে জলে-স্থলে আসল জানোয়ারও আছে অনেক রকম। মাঝখানে একটুখানি হাঁপ ছাড়বার জন্যে তাদের কারুর কারুর কথা এখানে কিছু বলতে চাই।

এখানে স্থলে থাকে অজগর, জাগুয়ার, পুমা, বানর, টেপির, প্রবাল সাপ, অন্ধ সাপ, আর্মাডিলো, ভ্যাম্পায়ার বাদুড় প্রভৃতি এবং জলে থাকে কুমির, হাঙর, লণ্ঠন মাছ, ব্যাঙ মাছ, কাছিম, শুশুক, অক্টোপাস, খুনে তিমি, স্কুইড, উকো মাছ, ছিপধারী মাছ, পাইপ মাছ, সিল, উড়ন্ত মাছ, ফিতে মাছ, এবং অন্যান্য তিমি জাতীয় মাছ প্রভৃতি-সব জীবজন্তুর ফর্দও এখানে দেওয়া অসম্ভব। এদের মধ্যে অনেক জন্তুই খোশমেজাজে ও বোম্বোটেদের চেয়ে কম হিংসাকুটে নয়, একটু সুবিধা পেলেই মানুষকে ফলার করবার জন্যে তারা হাঁ করে ছুটে আসে!

দু'একটা জন্তুর ভীষণ প্রকৃতির কথা এখানে বলব। এখানে যে জাতের কুমির পাওয়া যায়, তাদের 'কেম্যান' বলে ডাকা হয়। ভারতীয় কুমিরের সঙ্গে তাদের চেহারা ও প্রকৃতি ঠিক মেলে না। বোম্বেটেরা এইসব কুমিরের ভয়ে সর্বদাই তটস্থ হয়ে থাকত। একজন বোম্বেটে এই "কেম্যান" সম্বন্ধে যা বলছে তা হচ্ছে এই।

এই সব কেম্যান ভয়ঙ্কর জীব। সময়ে সময়ে এক একটা সত্তর ফুট লম্বা কেম্যানও দেখা গিয়েছে। নদীর ধার ঘেঁসে এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে তারা ভাসতে থাকে যে দেখলেই মনে হয়, যেন একটা পুরনো গাছ পড়ে গিয়ে জলে ভাসছে। সেই সময়ে কোনও গরু কি মানুষ নদীর ধারে এলে আর তার বাঁচোয়া নেই!

এদের দুষ্টুবুদ্ধিও বড় কম নয়। শিকার ধরবার আগে তিন-চারদিন ধরে এরা উপোস করে। সেই সময়ে ডুব মেরে নদীর তলায় গিয়ে কয়েক মণ পাথর

বা নুড়ি গিলে ফেলে এরা নিজেদের দেহ আরও বেশি ভারি করে তোলে। ফলে তাদের স্বাভাবিক শক্তি অধিকতর বেড়ে ওঠে।

কেম্যানরা শিকার ধরে টাটকা মাংস খায় না। আধা পচা না হওয়া পর্যন্ত তাদের জলের তলায় ডুবিয়ে রাখে। তাদের আরও অদ্ভুত রুচি আছে। এখানকার লোকেরা নদীর কাছাকাছি জায়গায় যদি মরা জন্তুর চামড়া শুকোবার জন্যে রেখে দেয়, তাহলে কেম্যানরা প্রায়ই ডাঙায় উঠে সেগুলো চুরি করে নিয়ে পালায়। সেই চামড়াগুলো কিছুদিন জলে ভিজলেই তাদের লোমগুলো ঝরে পড়ে যায়। তখন তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে।

একদিন একজন লোক নদীর জলে তার তাঁবু কাচছিল। হঠাৎ একটা কেম্যান এসে সেই তাঁবু কামড়ে ধরে জলে ডুব মারবার চেষ্টা করলে। সে ব্যক্তি অত সহজে তাঁবু খোয়াতে নারাজ হল-তাঁবুর একদিক ধরে প্রাণপণে টানাটানি করতে লাগল। বাধা পেয়ে কেম্যানের মেজাজ গেল চটে। সে এক ডিগবাজি খেয়ে জল থেকে ডাঙায় উঠে তাঁবুর অধিকারীকেও নিয়ে নদীর মধ্যে ডুব মারবার ফিকির করলে।

ভাগ্যে লোকটির কাছে একখানা বড় কসাই ছুরি ছিল এবং ভাগ্যে সে কেম্যানের দেহের ঠিক জায়গায় ছুরিখানা দৈবগতিকে বসিয়ে দিতে পারলে, তাই লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে সেই জলদানব তখনই খাবি খেতে বাধ্য হল! তার পেট ফেড়ে পাওয়া গেল রাশি রাশি বড় বড় নেড়ানুড়ি!

কেবল বড় বড় জীব নয়, কেম্যানরা পুঁচকে মাছি পেলেও টপ করে খেয়ে ফেলতে ছাড়ে না। কেম্যানরা ডাঙায় উঠে। ডিম ছাড়ে এবং ডিমগুলোর উপরে পা দিয়ে বালি ছড়িয়ে দেয়। রোদের আঁচে ডিম ফোটে, এবং বাচ্চাগুলো ডিম ছেড়ে বেরিয়েই জলের ভিতরে চলে যায়। পাখিরা অনেক সময়ে ডিম নষ্ট করে। মা কেম্যান সেদিকেও নজর রাখতে ভোলে না। পাখির ঝাঁক আসবার সম্ভাবনা

দেখলে প্রায়ই তারা নিজেদের ডিম আবার কোৎ কোৎ করে গিলে ফেলে। তারপর বিপদ কেটে গেলে ডিমগুলোকে ফের হড়াৎ করে উগরে বার করে দেয়!

ডিম ফুটলে মা কেম্যান তার বাচ্চাদের নিয়ে জলে খেলা করে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কেলা করতে করতে বাচ্চা কেম্যানরা তাদের মায়ের মুখের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে আসছে!

নদীপ্রধান জায়গায় আড্ডা গাড়তে হলে এই কেম্যানদের ভয়ে সব সময়েই আমরা ব্যস্ত থাকতুম। রাত্রে কারুকে পাহারায় না রেখে ঘুমোতে পারতুম না।

আমাদের দলের একজন লোক একবার তার কাফ্রি চাকরের সঙ্গে বনের ভিতরে ঢুকেছিল। কোথায় কোন ঝোপে একটা পাঁজি কেম্যান ঘুপটি মেরে ছিল, হঠাৎ সে বেরিয়ে এসে লোকটির একখানা পা কামড়ে ধরে মাটিতে পেড়ে ফেললে। তাই না দেখেই কাফ্রি চাকরিটা-সাহায্য করা দূরে থাক-টেনে লম্বা দিলে।

আমাদের বন্ধু ভীরু ছিল না, বিপদে পড়ে ভেবড়ে গেল না। তার গায়ে জোরও ছিল যথেষ্ট, যদিও সে জোর কেম্যানের পাল্লায় পড়ে বেশি কাজে লাগল না। কিন্তু সে তার লম্বা ছুরিখানা নিয়ে কেম্যানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। এ যুদ্ধ ডাঙায় হচ্ছিল বলেই রক্ষা, তাই খানিকক্ষণ যোঝাযুঝির পরে অনেকগুলো ছুরির ঘা খেয়ে কেম্যানটা ছটফট করতে করতে মারা পড়ল। আমাদের বন্ধুর সর্বাঙ্গ তখন ক্ষতবিক্ষত। রক্তপাতে নেহাৎ দুর্বল হয়ে সেইখানেই মড়ার মতো পড়ে রইল।

এতক্ষণ পরে কফ্রিবীরের মনে হল, তার মনিবের অবস্থাটো কিরকম, একবার উঁকি মেরে দেখে আসা উচিত! তার মনিবের দেহ কেম্যানের উদরে অদৃশ্য হয়ে যায়নি দেখে সে আশ্বস্ত হয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে প্রায় তিন মাইল

পথ পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হল। আমরা তখনই তাকে জাহাজে নিয়ে এলুম।

এই বদমাইশ কেম্যানরা প্রায়ই আমাদের জাহাজের কাছে আসত এবং জাহাজের গায়ে আঁচড়াআচড়ি করত। একদিন দড়িতে লোহার হুক লাগিয়ে আমরা একটা মস্ত কেম্যান ধরলুম। ধরা পড়ে সে কিন্তু জলের দিকে গেল না, উল্টে জাহাজের মই বেয়ে উপর দিকেই উঠতে লাগল! তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার দফা একেবারে রফা করে দিলুম!

ও মুল্লুকে খোলা হাওয়ায় রাত্রে কি ঘুমিয়েও নিশ্চিন্ত হবার যো আছে? ওখানে রাত্রে পিশাচবাদুড়রা শিকার খোঁজে। তারা এমন চুপিসাড়ে এসে মানুষের গায়ে ক্ষুরধার দাঁত দিয়ে ছাদা করে রক্ত টেনে নেয় যে, মানুষের ঘুম প্রায়ই ভাঙে না। আর না ভাঙাই ভাল! কারণ রক্তপানের পর ওই পিশাচবাদুড়েরা লালা দিয়ে ক্ষতস্থানের মুখ বন্ধ করে দিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে তারা যদি উড়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে ক্ষতের রক্তপড়া আর সহজে বন্ধ হতে চায় না। পিশাচবাদুড়ের লালা কেবল রক্ত বন্ধ করে না, ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠতেও দেয় না।

এ দেশে বাঘ জাতীয় জন্তুদের মধ্যে জাগুয়ার আর পুমাই প্রধান। জাগুয়ার পুমার চেয়ে আকারে বড় হয় এবং তার প্রকৃতিও বেশি হিংস্র। তারা প্রায়ই মানুষকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তাদের আক্রমণ আরও বিপজ্জনক এইজন্যে যে, তারা গাছের ডালে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে এবং তাদের কখন যে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার বিন্দকুটি শখ হবে, আগে থাকতে তা জানতে পারা যায় না।

পুমারাও গাছে চড়তে পারে। ব্রেজিলে তাদের 'কাউগার' বলে ডাকা হয়। উত্তর আমেরিকায় তাদের আর একটা নাম- 'পেণ্টার'। 'পুমা' হচ্ছে পেরু দেশিয়

নাম—যদিও ওই নামই বেশি চলে। তারা ল্যাজসুদ্ধ লম্বা হয় ছয় থেকে নয়ফুট পর্যন্ত।

পুমারা সবচেয়ে খেতে ভালবাসে ঘোড়ার মাংস। অভাবে গরু, মেষ, শূকর, হরিণ, ভেড়া, খরগোশ-এমনকি ইঁদুর ও শামুক পর্যন্ত! বানরও তাদের মনের মতো। বানররা এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়েও পা◌ের পায় না, কারণ গাছে গাছে লাফালাফি করতে বানরদের চেয়ে পুমারাও কম তৎপর নয়। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে পুমারা গাছের ডালে চড়তে পারে! দীর্ঘ লম্ফে তারা প্রায় চল্লিশ ফুট জমি পার হয়ে যায়!

কিন্তু মানুষের পক্ষে পুমা মোটেই বিপজ্জনক নয়। কারণ তারা মানুষকে সহজেই কাত করে ফেলতে পারলেও সাধারণত মানুষকে তেড়ে আক্রমণ করে না। এমন কি, অনেক সময়ে মানুষ তাকে আক্রমণ করলেও সে আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করে না! অথচ এই পুমা তার চেয়ে বড় ও হিংস্র জীব জাগুয়ারকেও আক্রমণ করে।

মধ্য আমেরিকার এক কাঠুরে একদিন জঙ্গলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পুমা ল্যাজ তুলে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এবং আদুরে বিড়ালের মতো ঘড়র ঘড়র শব্দ করতে করতে সেই কাঠুরের পায়ের ফাঁক দিয়ে খেলাচ্ছলে আনাগোনা করতে লাগল! কিন্তু সেই পুমা বেচারার অদৃষ্ট ছিল নেহাৎ মন্দ। কারণ কাঠুরে এমন ভয় পেলে যে, তার কুড়ুলের বাড়ি পুমাকে দিলে এক ঘা বসিয়ে! পুমা তখন সেই বন্দরসিকের কাছ ছেড়ে পালাতে বাধ্যহয়।

হাডসন সাহেব বলেন, আমি একবার একটা পুমাকে বধ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলুম। তাকে ধরেছিলুম আমি গলায় ফাঁসকল লাগিয়ে। সে একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে চুপ করে বসে রইল। আমি যখন ছোরা তুললুম। সে পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না। তাকে দেখে মনে হল, আমি যে তাকে বধ করব সে যেন তা বুঝতে পেরেছে! সে কাঁপতে লাগল, তার দু'চোখে জল ঝরতে লাগল,

সে করুণস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। তাকে বধ করার পর আমার মনে হল আমি যেন হত্যাকারী!

রেড ইন্ডিয়ানরা কিছুতেই পুমাকে মারতে চায় না। তাদের বিশ্বাস, পুমাকে বধ করলে সেই মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু হয়। রেড ইন্ডিয়ানরাই হচ্ছে আমেরিকার আদিম অধিবাসী। তারা পুমাকে মারে না বলেই বোধহয় পুমাও মানুষকে হিংসা করতে অভ্যস্ত হয়নি।

গরিলার মতো বড় জাতের বানর পৃথিবীতে আর নেই বলে শোনা যায়। কিন্তু হালে দক্ষিণ আমেরিকায় টাররা নদীর ধারে অদ্ভূত ও বৃহৎ এক অজানা জাতের বানরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

একদল লোক নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল, আচম্বিতে দুটো প্রকাণ্ড বানর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাদের আক্রমণ করে। একটাকে তারা গুলি করে মেরে ফেললে এবং অন্যটা আবার জঙ্গলের আড়ালে পালিয়ে গেল। যেটা মারা পড়ল সেটা স্ত্রীজাতীয় বানর হলেও তার মাথার উচ্চতা পাঁচফুটেরও বেশি। এর থেকেই বোঝা যায়; এ জাতের নর-বানররা মাথায় আরও বেশি ঢাঙা। এই অদ্ভুত জীব অনেকটা গরিলার মতো দেখতে হলেও গরিলা নয় মোটেই। পণ্ডিতরা বলছেন, এরা মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীব! এই নূতন আবিষ্কার জীবতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। পণ্ডিতরা বহুদিন ধরে মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীবের সন্ধান করে আসছেন, হয়তো এরা তাদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। এদের গায়ের জোর কত, আজও সে পরীক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়নি, তবে শক্তিতে হয়তো এরাও গরিলার চেয়ে কম যায় না।

মহাবীর গভর্নর

এইবার কাপ্তেন মর্গ্যানের পালা শুরু করা যাক। প্রথম পরিচ্ছেদেই মর্গ্যানের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি দিয়েছি। এই চাষার ছেলে মর্গ্যান বোম্বেটের ব্যবসায় অবলম্বন করেও কেমন করে `স্যার' পদবি পেয়ে লাটের গদিতে বসেছিল তারই বিচিত্র ইতিহাস বলব। এ সত্য ইতিহাস যে কোনও কাল্পনিক উপন্যাসেরও চেয়ে চিত্তাকর্ষক।

মর্গ্যানের আর একটা উপাধি হচ্ছে-"বোম্বেটের রাজা"! লোলোনেজের চেয়ে সে কম শক্তি পরিচয় তো দেয়নি বটেই, বরং সময়ে সময়ে তার কীর্তি লোলোনেজের যশগৌরবকেও স্নান করে দিয়েছে!

হেনরি মর্গ্যানের জন্ম ইংলণ্ডের ওয়েলস প্রদেশে। তার বাবা ছিলেন এক সাধু ও ধনী চাষী-নিজের সমাজে তিনি ছিলেন এক মাননীয় ব্যক্তি। কিন্তু ছেলেবয়স থেকেই বাপের কাজে মর্গ্যানের একটুও রুচি ছিল না। অতএব পিতার আশ্রয় ছেড়ে সে সাগরগামী জাহাজে একটা নিচু কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেই কাজের মেয়াদ ফুরোবার পর মর্গ্যান এল জামাইকা দ্বীপে। এটি ছিল বোম্বোটদের আর একটি প্রিয় দ্বীপ। বেকার হয়ে বসে না থেকে মর্গ্যান বোম্বোটদের এক জাহাজে চাকুরি গ্রহণ করলে। সমুদ্রে তিন-চারবার বোম্বেটেধর্ম পালন করে সে এ বিষম ব্যবসায়ের যা কিছু শেখবার সব শিখে ফেললে—এমন ভাল ছাত্র বোম্বেটেরা খুব কমই পেয়েছে!

তারপর কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে পরামর্শের পর মর্গ্যান স্থির করলে, তারাও সকলে মিলে রোজগারের পয়সা দিয়ে একখানা জাহাজ ক্রিয় করবে। রত্নাকর বহু রত্নের আকর—একখানা জাহাজ কিনলেই তা আহরণ করা ভারি সহজ।

জাহাজ কেনা হল। দলের ভিতরে মর্গ্যানই ছিল সকলের চেয়ে সাহসী,বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। কাজেই দলের বাকি সবাই একবাক্যে তাকেই দলপতি বা কপ্তেন বলে মেনে নিলে। সেইদিন মর্গ্যানের ছেলেবেলাকার স্বপ্ন সফল হল।

লোলোনেজের পরিণাম দেখে। যেমন ধারণা হয় যে, কোনও একজন মহাবিচারক সর্বদা সজাগ হয়ে আছেন, মর্গ্যানের জীবনকাহিনী পড়লে তেমনই সন্দেহ হয় যে, মাঝে মাঝে সেই মহাবিচারকও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েন!

প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রাতেই নতুন কাপ্তেনের উপরে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল। সে একে একে অনেকগুলো জাহাজ দখল করে আবার জামাইকায় ফিরে এল। এবং এই অভাবিত সাফল্যে বোম্বোটেদের ভিতরে তার মানসম্ভ্রম বেড়ে উঠল অত্যন্ত!

জামাইকা দ্বীপে ছিল এক বুড়ো বোম্বেটে, তার নাম ম্যানসভেল্ট। সে এই সময়ে খুব বড় এক নৌ-বাহিনী গঠন করে চারিদিকে লুটপাট করবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে দেখলে, মর্গ্যান হচ্ছে একজন মস্ত কাজের লোক। অতএব তাকে সে নিজের ভাইস আডমিরালের পদে নির্বাচন করে নিলে। ভুল নির্বাচন হয়নি! এই হল মর্গ্যানের বোম্বেটে জীবনের দ্বিতীয় উন্নতি।

পনেরখানা জাহাজ ও পাঁচশ বোম্বেটে নিয়ে ম্যানসভেল্ট ও মর্গ্যান সমুদ্রে পাড়ি দিলে। তারা প্রথমেই স্পানিয়ার্ডদের দ্বারা অধিকৃত সেন্ট কাথারাইন দ্বীপে গিয়ে নামল। তারপর লড়াই করে স্পানিয়ার্ডদের কাছ থেকে সেই দ্বীপটাি কেড়ে নিলে।

কিন্তু তার অল্পদিন পরেই বুড়ো বোম্বেটে ম্যানসভেল্ট পৃথিবীর লীলাখেলা সাঙ্গ করে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে চলে গেল।

তারপর কাপ্তেন মর্গ্যান নিজেই এক নৌ-বাহিনী গঠন করলে। বারখানা ছোট বড় জাহাজ ও সাতশ লোক নিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ল। দুএকটা ছোটখাট শহর লুট করলে। কিন্তু লুটের মাল ভাগ করবার সময়ে বোম্বোটেদের

মধ্যে এমন মন কষাকষি হল যে, কপ্তেন মর্গ্যানের কাছ ছেড়ে একদল লোক রাগ করে চলে গেল। তাদের সন্দেহ হয়েছিল, মর্গ্যান জুয়াচুরি করে অনেক টাকা সরিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভব, তাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নয়। যারা দল ছাড়ল তারা সবাই ফরাসি। মর্গ্যানের সঙ্গে রইল কেবল ইংরেজ বোম্বেটেরা।

কিন্তু দল ছাোট হয়ে গেল বলে মর্গ্যান একটুও দমল না। আরও কিছু লোক ও জাহাজ সংগ্রহ করে মর্গ্যান আর একদিকে আবার পাড়ি দিলে। কোথায় যাওয়া হবে সেকথা কারুর কাছে প্রকাশ করলে না। খালি বললে, আমি তোমাদের সর্দার, তোমাদের ভালমন্দের জন্যে আমিই দায়ী রইলুম। আমাকে বিশ্বাস করো, তাহলেই চটপট তোমরা ধনী হতে পারবে।

বোম্বেটেরা মর্গ্যানের কথায় বিশ্বাস করলে!

দিন কয় পরে তারা কোস্টারিকা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হল।

তখন মর্গান বললে, আমরা পাোর্টে বেলো শহর লুট করতে যাচ্ছি। এ কথা আমি আর কারুকে বলিনি, সুতরাং চরের মুখে খবর পেয়ে শত্রুরা সাবধান হবার সময়ও পায়নি।

দু'একজন প্রধান বোম্বেটে বললে, পোর্টো বেলো হচ্ছে মস্ত শহর, সেখানে অনেক সৈন্য আছে। আমাদের লোকসংখ্যা মোটে সাড়ে চারশ। কেমন করে আমরা অতবড় শহর দখল করব?

মর্গান বললে, আমাদের দল ছোট বটে, কিন্তু আমাদের জান খুব বড়। দল ছোট হলেই একতা আর লাভের সম্ভাবনা বেশি। কুছ পরোয়া নেই-এগিয়ে চলো!

অতঃপর পোর্টো বেলো নগরের একটু বর্ণনা দিতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে স্পেনিয় রাজ্যের মধ্যে পোর্টো বেলো তখন দুর্ভেদ্য নগর হিসাবে হাভানা ও কার্টেজেনার পরেই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বন্দরের পিছনেই নগরকে রক্ষা করবার জন্যে দুটি বড় বড় দুর্গ আছে। এই দুর্গ দুটির অজ্ঞাতসারে বন্দরের

মধ্যে কোনও জাহাজ বা নৌকো প্রবেশ করতে পারে না। দুর্গ দুটিও এমন সুরক্ষিত যে, সকলে তাদের অজেয় বলে মনে করে। প্রথম দুর্গটির মধ্যে তিনশ সৈন্য থাকে। নগরের এখনকার জনসংখ্যা সাড়ে নয়হাজারের উপরে, তখন কম ছিল। মর্গান সরাসরি বন্দরে প্রবেশ না করে, সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সমুদ্র কুলে চুপিসাড়ে জাহাজ লাগালে। তারপর স্থলে পদব্রজে ও নদীতে নৌকোয় চড়ে তারা প্রথম দুর্গটির কাছে এসে পড়ল। দুর্গের অধিবাসীদের বলে পাঠালে- হয় আত্মসমর্পণ কর, নয় মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

উত্তরে দুর্গের কামানগুলো ভৈরব হুঙ্কারে অগ্নিবর্ষণ করলে। কামানগর্জন শুনে দূর থেকে নগরের বাসিন্দারা সভয়ে বুঝতে পারলে যে, কাছেই কোনও মস্ত বিপদ এসে আবির্ভূত হয়েছে।

নিকটবর্তী অঞ্চলের স্পানিয়ার্ডরা বোম্বেটেদের বাধা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। কিন্তু কোনও ফল হল না, তারা হেরে গেল, অনেকে বন্দি হল। দুর্গের ভিতরের সৈন্যরাও শেষ পর্যন্ত দুর্গারক্ষা করতে পারলে না। কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়ে শত্রু এমন অতর্কিত শিয়রে এসে পড়েছিল যে, তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হল না। মর্গ্যান দুর্গ দখল করলে। মর্গান হুকুম দিলে, প্রত্যেক বন্দীকে কেটে দু'খানা করে ফেল! শহরের লোেকেরা তাহলে বুঝতে পারবে, আমরা বড় লক্ষ্মীছেলে। নই-আমাদের বাধা দিলে তাদেরও নিশ্চিত মরণ!--বন্দীদের মাথাগুলো উড়ে গেল।

দুর্গের ভিতরের সে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষরা ধরা পড়েছিল, তাদের একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এইবার বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল, দুর্গসুদ্ধ সমস্ত প্রাণী শূন্যে উড়ে পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেল। কেবল দুর্গের অধ্যক্ষ প্রাণ নিয়ে নগরে প্রস্থান করতে পারলেন।

বোম্বেটেরা নগর আক্রমণ করতে চলল। সেখানকার বাসিন্দারা তখনও আত্মরক্ষার সময় পায়নি।--তারা আত্মরক্ষা করতে পারলেও না। পোর্টো বেলোর

গভর্নর তাদের কোনওরকমে উত্তেজিত করতে না পেরে, বাকি যে দুর্গটা তখনও শত্রুহস্তগত হয়নি, তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বোম্বেটেরা নগর দখল ও লুট করে অনেক পাদ্রীকে সপরিবারে বন্দি করলে। ওদিকে দুর্গ থেকে তাদের উপরে গোলাগুলি বৃষ্টি হচ্ছিল অজস্রধারে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বোম্বেটেরাও দুর্গ আক্রমণ করলে। তাদের এ আক্রমণের আর এক উদ্দেশ্য, শহর থেকে অনেক নাগরিক বহু ধনসম্পত্তি নিয়ে কেল্লার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

সারাদিন যুদ্ধ চলল—কোন পক্ষের জয় হবে তখনও তা অনিশ্চিত। অনেক বোম্বেটে মারা পড়ল—তবু তারা কেল্লার কাছ ঘেঁষতে পারলে না। তারা বোমা ছাড়েবার সুযোগ পর্যন্ত পেলে না-কেল্লার পাঁচিলের কাছে গেলেই উপর থেকে হুড়মুড় করে ভারি ভারি পাথর ও জলন্ত বারুদ এসে পড়ে তাদের যমালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

মগ্যান প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে শেষ উপায় অবলম্বন করলে। সে আগে কেল্লার পঁচিলে ওঠবার জন্যে খুব উঁচু দশ-বারখানা মই তৈরি করালে। তারপর বন্দি পাস্ত্রী ও তাদের স্ত্রী-কন্যাদের বললে, সেই মইগুলো পাঁচিলের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে আসতে।

গভর্নরকে জানানো হল, এখনও আত্মসমর্পণ কর।

গভর্নর বললেন, প্রাণ থাকতে নয়।

তখন মই নিয়ে যাবার হুকুম হল। মর্গান ভেবেছিল, সপরিবারে ধর্মযাজকেরা মই নিয়ে অগ্রসর হলে গভর্নর তাঁদের উপরে আর গুলিবৃষ্টি করতে পারবেন না।

বোম্বেটের দল পাদ্রীদের পিছনে পিছনে এগিয়ে পিস্তল উচিয়ে বললে, শীঘ্র পাঁচিলে গিয়ে মই লাগাও। নইলে গুলি করে মেরে ফলব।

কেল্লার পাঁচিলের উপরেও গভর্নর সৈন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন, তারাও বন্দুক তুললে। পাদ্রী ও তাদের পরিবারবর্গ করুণ চিৎকারে স্পানিয়ার্ডদের বললেন, আমরা তোমাদেরই ধর্মযাজক বাবা, আমাদের মেরো না।

কিন্তু মর্গ্যান এই বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গভর্নরকে ভুল বুঝেছিল- সৈনিকধর্মপালনের জন্যে তিনি আর সব ধর্মকে বর্জন করতে প্রস্তুত।

সপরিবারে ধর্মযাজকেরা কাঁধে মই নিয়ে অগ্রসর হলেন, সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার উপর থেকে শিলাবৃষ্টির মতো গোলাগুলি এসে তাঁদের ভূতলশায়ী করতে লাগল। বাইরে থেকে শত্রুইহাোক আর মিত্রই হাোক, কেল্লার ত্রিসীমানায় কারুকে আসতে দেওয়া হবে না-এই ছিল গভর্নরের প্রতিজ্ঞ।

পাদ্রী ও তাদের পরিবারবর্গের দেহ একে একে মাটির উপরে আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তবু তারা কোনওরকম পাঁচিলের গায়ে মই লাগিয়ে পালিয়ে এলেন। তখন বোম্বেটেরা বোমা ও বারুদের পাত্র হাতে করে পাচিলের উপরে গিয়ে দাঁড়াল এবং কেল্লার ভিতরে সেইসব নিক্ষেপ করতে লাগল।

স্পানিয়ার্ডরা তখন বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলে।

কিন্তু সেই বীর গভর্নর! কোনও আশা নেই, তবু তিনি আটল! তখনও নিজের সৈন্যদের ডেকে তিনি বলছেন, অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! শত্রুবধ করো!

কেউ তাঁর কথায় কান পাতলে না, তারা বোম্বোেটদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জীবনভিক্ষা করতে লাগল।

—তবে মর কাপুরুষ কুকুরের দল!—এই বলে তাঁর যেসব সৈন্য কাছাকাছি ছিল, মুক্ত তরবারি নিয়ে তিনি তাদের উপরে গিয়ে পড়লেন এবং নিজের হাতেই নিজের সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন।

বোম্বোেটদের নীচহৃদয় পর্যন্ত এই অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা সসম্ভ্রমে বললে, এখন আপনি আত্মসমর্পণ করবেন তো?

গভর্নর দৃঢ়হস্তে অসিধারণ করে সগর্বে মাথা তুলে বললেন, নিশ্চয়ই নয়! কাপুরুষের মতো তোদের হাতে আমি ফাঁসিতে মরব না—আমি মরতে চাই লড়াই করতে করতে বীর সৈনিকের মতো।—বলেই তিনি আবার তাদের আক্রমণ করলেন।

গভর্নরের সহধর্মিণী ও কন্যা কাঁদতে কাঁদতে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন—ওগো তুমি অস্ত্র ছাড়ো! আত্মহত্যা করে আমাদের পথে বসিও না।

কিন্তু সেই বীরের পাথর-প্রাণ কোনও অশ্রুই নরম করতে পারলে না-সিংহের মতো একলাই তিনি অগুণতি শত্রুর সঙ্গে যুঝতে লাগলেন।

বোম্বেটেরা তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করবার অনেক চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। শেষ পর্যন্ত শত্রু মারতে মারতে নিজের শেষ রক্তপাত করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যে জাতির মধ্যে এমন বীরের জন্ম হয় সে জাতি ধন্য!

তারপর যা হবার তা হল। অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা। পোর্টো বেলোর যত ঐশ্বর্য দুর্গের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল, সমস্তই বোম্বেটেরা হস্তগত করলে। অত বড় বীর গভর্নরের হাত থেকে অমন অজেয় দুর্ভেদ্য দুর্গ এত কম সৈন্য নিয়ে মর্গ্যান যে কি করে কেড়ে নিলে, সকলেরই কাছে সেটা প্রহেলিকার মতো বোধ হল।

পানামা নগরের স্পানিয়ার্ড গভর্নর সবিস্ময়ে বোম্বেটেদের কাছে দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন,—কোন আশ্চর্য হাতিহার দিয়ে তোমরা দুর্গের অত বড় বড় কামান ব্যর্থ করে দিয়েছ?

মর্গ্যান সহাস্যে দূতের হাতে একটা ছোট পিস্তল দিয়ে বলে পাঠালে, কেবল এই আশ্চর্য হাতিয়ার দিয়ে আমি কেল্লা ফতে করেছি! এই অস্ত্র আমি এক বৎসরের জন্যে আপনাকে দান করলুম। তারপর নিজেই পানামায় গিয়ে আমার অস্ত্র আবার আমি ফিরিয়ে আনব।

পানামার গভর্নর। তখনই সেই পিস্তল ফেরৎ পাঠিয়ে বললেন, এ অস্ত্রে আমার দরকার নেই। তোমাকে আর কষ্ট করে পানামায় আসতে হবে না। কারণ পোর্টো বেলোর মতো এত সহজে পানামা আত্মদান করবে না।

পোর্ট বেলো শহরে শরীরী মড়কের মতো এক পক্ষাকাল বাস করে চারিদিকে হাহাকার তুলে মর্গ্যান সদলবলে আবার জাহাজে এসে উঠল। বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে তারা কিউবা দ্বীপে ফিরে এল। বোম্বেটাদের সবাই বুঝলে, লোলোনেজের অভাব পূরণ করতে পারে এখন কেবল এই কাপ্তেন মর্গ্যান! তার তারকা আজ উদীয়মান!

অমানুষী অত্যাচার ও অগ্নিপোত

মর্গ্যান তারপর এল জামাইকা দ্বীপে-এখানকার গভর্নর হচ্ছেন তারই স্বজাতি, অর্থাৎ ইংরেজ।

মর্গ্যানের শক্তি ও খ্যাতি শুনে ফুলমধুলোভী ভ্রমরের মতো চারিদিক থেকে বোম্বেটের পর বোম্বেটে এসে তার দলে যোগ দিতে লাগল-তাদের বেশির ভাগই ইংরেজ। জামাইকার গভর্নর পর্যন্ত তাকে আর বোম্বেটের মতো অভ্যর্থনা করলেন না,-এমন কি তাকে একখানা মস্তবড় জাহাজও দান করলেন। এমন দান পেয়ে মর্গ্যানের আনন্দ আর ধরে না, কারণ এর উপরে ছিল ছত্রিশটা কামান! এতবড় জাহাজ কোনও বোম্বেটেরই ভাগ্যে জোটে না।

সেই সময়ে ওখানে এসে একখানা বড় ফরাসি জাহাজও নাঙ্গর করেছিল, তার উপরে ছিল চব্বিশটা ইস্পাতের ও বারটা পিতলের কামান। এ জাহাজখানাকে পেলে তার শক্তি অত্যন্ত বেড়ে উঠবে বলে মর্গ্যান ফরাসিদের কাপ্তেনকে নিজের দলে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করলে। কিন্তু ফরাসিরা রাজি হল না-ইংরেজ বোম্বোটেদের তারা বিশ্বাস করে না।

মর্গানের ভারি রাগ হল—ফরাসিদের সাজা দেবার জন্যে ছুতো খুঁজতে লাগল। ছুতো পাওয়া গেল।

কিছুদিন আগে সমুদ্রে খাদ্যাভাব হওয়ার দরুন ফরাসিরা একখানা ইংরেজ জাহাজ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল এবং তখন জাহাজে টাকা ছিল না বলে ইংরেজদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছিল যে, জামাইকায় ফিরে এসে তারা খাবারের দাম কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু এই ছুতেই বিবেক বুদ্ধিহীন মর্গ্যানের পক্ষে যথেষ্ট হল। সে বাইরে কিছু না ভেঙে ফরাসি জাহাজের কাপ্তেন ও কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীকে নিজের জাহাজে নিমন্ত্রণ করলে। তারা কোনওরকম

সন্দেহ না করেই নিমন্ত্রণ রাখতে এল। তখন তাদের হাতে পেয়ে দুষ্ট মর্গ্যান বললে, ইংরেজদের কাছ থেকে তোমরা খাবার কেড়ে নিয়েছ। সেই অপরাধে তোমাদের বন্দি করলুম।—তারপর সে জামাইকার গভর্নরের দেওয়া বড় জাহাজখানায় বন্দীদের পাঠিয়ে দিলে।

আবার নতুন সমুদ্রযাত্রা করবার দিন স্থির হল। ইংরেজ বোম্বেটেরা আসন্ন লাভের আনন্দে জাহাজে জাহাজে উৎসবে মেতে উঠেছে। নাচ-গান-বাজনা চলছে- সবাই মদের নেশায় বেহুঁশ। আচম্বিতে একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ ডেকে উঠল এবং সমুদ্রের বুকে যেন দপ করে জ্বলে উঠল একসঙ্গে শত শত বিদ্যুৎ!..চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল।

মর্গ্যানের সেই বড় সাধের বিরাট জাহাজ শূন্যে উড়ে গেল ভেঙে গুড়ো হয়ে। মাত্র ত্রিশজন লোক কোনওগতিকে রক্ষা পেলে এবং এক মুহূর্তেই মারা পড়ল তিনশ পঞ্চাশজন ইংরেজ।

বোম্বেটোদের মতে, বন্দি ফরাসি কাপ্তেন ও তাঁর সঙ্গীরাই নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জাহাজের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

মর্গ্যানের সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফল তাকে হাতে হাতেই পেতে হল।

অতবড় জাহাজ ও এত লোক হারিয়ে মর্গান একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। রাগে অজ্ঞান হয়ে বাকি বোম্বোেটেদের নিয়ে আবার ফরাসিদের সেই বড় জাহাজখানা আক্রমণ ও অধিকার করলে।

তারপর তারা সমুদ্রের জলে নিজেদের দলের বোম্বোটেদের লাশ খুঁজতে লাগল -অন্তোষ্টিক্রিয়ার জন্যে নয়, লুণ্ঠন করবার জন্যে। যাদের আঙুলে আংটিছিল তাদের আংটিসুদ্ধ আঙুল কেটে নেওয়া হল, যাদের পকেটে টাকাকড়ি ছিল তাদের পকেট থেকে টাকাকড়ি চুরি করা হল। তারপর মৃতদেহগুলোকে সামুদ্রিক জীবদের মুখে সমর্পণ করে তারা অম্লানবদনে আবার জাহাজে উঠে অগাধ সাগরে পাড়ি দিল।

দলের সাড়ে তিনশ লোক মারা পড়ল, তবু মর্গানের নামের জোরে সঙ্গীর সংখ্যা হল যথেষ্ট! পনেরখানা জাহাজে প্রায় হাজারখানেক বোম্বেটে তার সঙ্গে চলল। দুরাত্মার পাপসঙ্গীর অভাব হয় না। সবচেয়ে বড় জাহাজে রইল মর্গ্যান নিজে-কিন্তু তাতে কামান ছিল মা্েটে চোদ্দটা, তাও ছোট ছোট।

এবারে মর্গ্যান কিছু মুশকিলে পড়ল। কারণ যাত্রারম্ভের সময়ে তার মাথায় অনেক বড় বড় ফন্দি ছিল; কিন্তু কিছুদিন পরে তার দলের প্রায় পাঁচশ লোকসুদ্ধ সাতখানা জাহাজ আকুল সাগরে কোথায় হারিয়ে গেল। মর্গ্যান কিছুকাল অপেক্ষা করেও তাদের দেখা পেলে না। কাজেই এখানে ওখানে ছোটখাট ডাকাতি করেই সে সময় কাটাতে লাগল।

মর্গ্যানের দলে এক ফরাসি কাপ্তেন আছে, সে আগে ছিল বিখ্যাত লোলোনেজের সঙ্গে। সে পরামর্শ দিলে, আপনিও মারাকেবো শহর লুট করবেন চলুন। আমি সেখানকার পথঘাট চিনি, আমাদের কোনও কষ্ট হবে না।—এ প্রস্তাবে মর্গ্যানের নারাজ হবার কারণ ছিল না। তারা মারাকেবোর সমুদ্রে এসে হাজির হল। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে যখন শহরের খুব কাছে এসে পড়ল, স্পানিয়ার্ডরা তখন তাদের দেখতে পেলে। লোলোনেজের নগর লুণ্ঠনের পর তারা এখন আর একটা নূতন কেল্লা তৈরী— সেইখানে বোম্বেটেদের সঙ্গে তাদের বিষম যুদ্ধ হল। কিন্তু এবারেও স্পানিয়ার্ডরা জিততে পারলে না, মারাকেবো শহরের হতভাগ্য বাসিন্দারা আবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করলে। সেই একই বিয়োগান্ত নাটকের পুনরাভিনয়। সবিস্তারে আর বর্ণনা করবার দরকার নেই।

তারপর জিব্রালটার নগরের পালা। কিন্তু লোলোনেজ তাদের যে সর্বনাশ করে গিয়েছিল, জিব্রালটারের বাসিন্দারা এখনও তা ভুলতে পারেনি। কাজেই বোম্বোটেদের সাড়া পেয়ে তারা পঙ্গপালের মতো দলে দলে শহর ছেড়ে পলায়ন করতে লা্িগল—সমস্ত মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়ে।

বোম্বেটেরা শহরে ঢুকে দেখলে-সে এক নিঝুম পুরী। না আছে রসদ, না আছে। ধনরত্ন, না আছে জনমনুষ্য! চারিদিক সমাধির মতো খাঁ খাঁ করছে।

কেবল একটি লোক পালায়নি। তার পোষাক ময়লা, তালিমারা, ছেড়াখোড়া। বোম্বেটেরা জানত না যে, সে জন্মজড়ভরত-পাগল বললেও চলে।

তারা তাকে যত কথা শুধোয়, সে খালি বলে, আমি কিছু জানিনা, আমি কিছু জানি না।

বোম্বেটেরা তখন তাকে নিজেদের প্রথামত বিষম যন্ত্রণা দিতে শুরু করলে।

পাগলা বললে, ওগো, আর যাতনা দিওনা! আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাদের আমার সমস্ত ঐশ্বর্য দান করছি!

বোম্বেটেরা ভাবলে, এ লোকটা নিশ্চয়ই কোনও ধনী ব্যক্তি, কেবল তাদের চোখে ধুলো দেবার ফিকিরেই গরিবের সাজ পরেছে।

অতএব তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাগলা তাদের নিয়ে একখানা ভাঙা কুঁড়েঘরে গিয়ে বললে, দেখো, আমার কত ঐশ্বর্য!

ঘরের ভিতরে ছিল কেবল কতকগুলো মাটির বাসন ও গুটিতিনেক টাকা।

বোম্বেটেরা খাপ্পা হয়ে বললে, কী! আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা? দেখ। তবে মজাটা।

পাগলা বললে, জানো আমি কে? আমার নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত সিবাস্টিয়ান স্যানসেজ, আমি হচ্ছি মারাকেবোর লাটসাহেবের ভাই।

বোম্বেটেরা তার কথা সত্য ভেবে নিয়ে অধিকতর লুব্ধ হয়ে তাকে আবার যন্ত্রণাদিতে লাগল। তাকে দড়িতে বেঁধে শূন্যে টেনে তুললে এবং তার গলায় ও দুই পায়ে বিষম ভারি ভরি বোঝা বুলিয়ে দিলে। তারপর সেই অভাগাকে পাপিষ্ঠরা জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারলে।

বোম্বেটেরা তারপর সে দেশের বনে বনে চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল এবং অনেক চেষ্টার পর একে একে প্রায় আড়াইশ স্পানিয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করলে।

স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে ছিল এক কাফ্রি গোলাম। মর্গান তাকে হুকুম দিলে, ওরা কিছুতেই যখন টাকার কথা বলবে না, তখন ওদের দল খানিকটা হালকা করে দে!

কফ্রি গোলাম একে একে কয়েকজনকে হত্যা করলে-অন্যান্য বন্দীদের চোখের সামনেই। তারপর বোম্বোটেদের খুশি করবার জন্যে সেই দুষ্ট কফ্রি একজন বৃদ্ধ স্পানিয়ার্ডকে দেখিয়ে বললে, ওই লোকটা অনেক টাকার মালিক।

বুড়োর কপাল পুড়ল। বোম্বেটেরা টাকা চাইলে, বুড়ো বললে, এ পৃথিবীতে আমার যথাসর্বস্ব হচ্ছে চারশ টাকা।

বোম্বেটেরা বিশ্বাস করলে না। দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা সেই বুড়োর দু'খানা হাতই মড়মড় করে ভেঙে দিলে। তারপর তার হাত ও পায়ের বুড়ো আঙুলে দড়ি বেঁধে তাকে শূন্যে টেনে তুললে। সেই অবস্থায় তারা লাঠি দিয়ে দড়ির উপরে এমন ঝাঁকানি মারতে লাগল যে, প্রত্যেক ঝাঁকানির সঙ্গেই বৃদ্ধের ক্ষীণ প্রাণ বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা হল। এই বর্বরচিত নিষ্ঠুরতাতেও খুশি না হয়ে বোম্বেটেরা বুড়োর পেটের উপরে সেই অবস্থাতেই আড়াই মণ বোঝা চাপিয়ে দিলে। এবং সেই সঙ্গে আগুন জ্বেলে হতভাগ্যের দাড়ি-গাোঁফ, চুল ও মুখের চামড়া-সব পুড়িয়ে দিলে। তারপর তাকে নামিয়ে একটা থামে বেঁধে রাখা হল এবং চারদিন তাকে প্রায় অনাহারে রাখা হল বললেই চলে।

বুড়ো বেচারি খুব ছোট একটা সরাইখানা চালিয়ে কোনও রকমে দিন গুজরান করত। অনেক কষ্ট ও অনেক চেষ্টার পর কিছুটাকা ধার করে এনে বোম্বোটদের দিয়ে সে যাত্রা সে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু তার দেহ এমন ভয়ানক ভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল যে, খুব সম্ভব তাকে আর বেশিদিন এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হয়নি।

এরাই হচ্ছে প্রেমের অবতার খ্রিস্টদেবের শিষ্য-যার ধর্মের বড় মন্ত্র হচ্ছে প্রেমের মন্ত্র। এবং এরাই ভারতবাসীদের ও আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে বর্বর বলে। উপরন্তু এদের মতে এশিয়ার বাসিন্দারা নাকি নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে অতুলনীয়। কিন্তু যেসব অকথ্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজ রাজের কাছ থেকে মর্গ্যান সম্মান, উপাধি ও উচ্চপদ লাভ করেছে, সেগুলোকে আমরা কি পরম করুণার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলে মাথায় তুলে রাখব? মর্গান ওখানে পূর্বকথিত ব্যাপারটিরও চেয়ে ভয়ানক এমন সব পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল, পাঠকরা সহ্য করতে পারবেন না বলে এখানে সেগুলোর কথা আর বললুম না। তাদের তুলনায় ঢের বেশি ভদ্র ও শান্ত দুটো দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি।

অনেক স্পানিয়ার্ডকে ধরে মর্গ্যান পায়ে ও হাতে পেরেক মেরে ক্রুশে বিদ্ধ করে রেখেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের ও পায়ের আঙুলগুলোর ফাঁকে জ্বলিয়ে দিয়েছিল তৈলাক্ত সলিতা। এবং আরও অনেককে ধরে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাদের পাগুলোকে এমন কৌশলে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল যে, যাতে তারা ‘রোস্টের মতো ধীরে ধীরে সিদ্ধ হয়। এত জঘন্য অত্যাচার কেবল সামান্য টাকার জন্যেই—যে টাকা পরে বোম্বেটেরা মদ খেয়ে জুয়া খেলে দুদিনেই উড়িয়ে দেবে!

জিব্রালটার শহরে ঐশ্বর্যলাভের দিক থেকে কিছুই সুবিধা করে উঠতে না পেরে মর্গ্যান বুঝলে, এ যাত্রা কপাল তার ভাল নয়। কিন্তু সেই সময়েই খবর পাওয়া গেল, জিব্রালটারের গভর্নর অনেক ধনরত্ন ও শহরের স্ত্রীলোকদের নিয়ে নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে আছেন। মর্গ্যান অমনি নৌকো ভাসিয়ে সদলবলে তাদের ধরতে ছুটল।

খবর পেয়ে গভর্নর দ্বীপ থেকে পালিয়ে সকলকে নিয়ে একটা পাহাড়ের শিখরে উঠে বসে রইলেন। বোম্বেটেরাও নাছোড়বান্দা-তারাও পিছনে পিছনে ছুটল। তখন বর্ষাকাল। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে যাবার পথে নদীর জল ফুলে উঠেছে। স্রোতের তোড়ই বা কী! নদী সেদিন পৃথিবীকে অনেকগুলো

বোম্বেটের পাপভার সইবার দায় থেকে নিস্কৃতি দিলে-স্রোতের টানে তারা একেবারে সটান পাতালে চলে গেল।

পাহাড়ের তলায় গিয়ে মর্গ্যানের সব আশা ফুরিয়ে গেল। খাড়া পাহাড়ের গা-পাঁচ সাত হাত উপরেও উঠবার উপায় নেই। একটিমাত্র সরু লিকলিকে পথ টঙে গিয়ে উঠেছে-সে পথে সার বেঁধে পাশাপাশি দুজন যেতে পারে না। টঙ থেকে যদি একজনমাত্র স্পানিয়ার্ড গুলি চালায়, তাহলে একে একে শত শত বোম্বেটের দেহ হবে প্রপাতধারণীতলে। তার উপরে বৃষ্টির জলে বোম্বেটোদের সমস্ত বারুদ ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে যদি মাত্র পঞ্চাশজন স্পানিয়ার্ড বুক বেঁধে আক্রমণ করত, তাহলে সেই চারপাঁচশ বোম্বেটে মনুষ্যসমাজকে আর যন্ত্রণা দেবার সুযোগ পেত না। কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে স্পানিয়ার্ডরা তখন নেতিয়ে পড়ে সব সাহস থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। তারা আক্রমণ করবে কি, গাছের পাতাটি নড়লেও ‘ওই বোম্বেটে আসছে’ ভেবে আঁতকে পালিয়ে যায়।

কিন্তু মর্গ্যান তা বুঝতে পারেনি। সেই সরু পথে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর ছায়া দেখে সে আর অগ্রসর হতে সাহস করলে না, সমস্ত লোকজন নিয়ে মনেপ্রাণে সেখান থেকে সরে পড়ল।

জিব্রালটোর নগরে ফিরে এসে পাঁচ হপ্তা ধরে নারকীয় কাণ্ড করবার পর বোম্বেটেরা বিষম এক দুঃসংবাদ পেলে। স্পানিয়ার্ডদের তিনখানা বড় বড় যুদ্ধজাহাজ মারাকেবো বন্দরে এসে হাজির হয়েছে। সবচেয়ে বড় জাহাজখানায় কামান আছে চল্লিশটা, তার চেয়ে কিছু ছোট জাহাজে ত্রিশটা, সব ছোট জাহাজে চব্বিশটা। মর্গ্যানের সবচেয়ে বড় জাহাজেও চোদটার বেশি কামান নেই।

বোম্বোটেদের ফেরবার পথ হচ্ছে মারাকেবো বন্দরের ভিতর দিয়েই। তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! আর বুঝি রক্ষা নেই-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবার সময় এসেছে।

কিন্তু সত্যিকার নেতার আসল গুণ হচ্ছে, দারুণ বিপদেও হাল না ছাড়া। এ গুণ মর্গানেরও ছিল। সে বুক ফুলিয়ে বললে, কুছ পরোয়া নেই। আসুক ওরা,—আমরাও লড়াই করব।

স্পানিয়ার্ড নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরালের এক চিঠি এল, বোম্বেটে সর্দার মর্গ্যান, আমাদের মহারাজের রাজত্বে এসে তুমি যেসব ভীষণ উৎপাত করছ, তা আমি শুনেছি। অতঃপর তুমি যদি আমার কাছে বিনাবাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ কর আর লুটের সমস্ত মাল ও বন্দীদের ফিরিয়ে দাও, তাহলে আমি স্বীকার করছি, তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেব। আর আমাদের কথা যদি না শোনো, তাহলে এও প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমাদের প্রত্যেককেই আমি বধ না করে ছাড়ব না!

বোম্বো‌েটেদের পরামর্শসভা বসল। মর্গ্যানের কথার উত্তরে সকলেই একবাক্যে বললে, "র্দার, জান কবুল! এত বিপদ সয়ে আমরা যে লুটের মাল পেয়েছি আর তা ফিরিয়ে দেব না! যতক্ষণ আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকবে ততক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ করব না!

তবু যদি ভালয় ভালয় এই বিপদ চুকে যায়, সেই আশায় মর্গ্যান অ্যাডমিরালের কাছে তিনটি প্রস্তাব করে পাঠালে প্রথমত, আমরা আর মারাকেবো শহরের কোনও অনিষ্ট করব না বা বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোনও অর্থ দাবি করব না। দ্বিতীয়ত, বন্দীদের আমরা স্বাধীনতা দেব। তৃতীয়ত, কেবল জিব্রালটারের বাসিন্দারা আমাদের যে অর্থ দেবে বলে স্বীকার করেছে, তা না পাওয়া পর্যন্ত এখানকার চারজন প্রধান ব্যক্তি জমিনদার রূপে আমাদের সঙ্গে থাকবে। অ্যাডমিরাল জবাবে বলে পাঠালেন : তোমাদের আর দুদিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি আত্মসমর্পণ না কর, তাহলে তোমাদের কারুকে আমি ক্ষমা করব না।

মর্গ্যান খাপ্পা হয়ে বললে, সাজো তবে সবাই রণসাজে! নিজের জোরে আমরা এই ফাঁদ ছিড়ে বেরিয়ে যাব। দেখি, আমাদের কে রুখতে পারে!

তখনই তারা সর্বাগ্রে একখানা অগ্নিপোত নির্মাণে নিযুক্ত হল। অগ্নিপোত কাকে বলে এদেশের অনেকেই বোধহয় তা জানেন না। সেকালে জলযুদ্ধে প্রায়ই এই অগ্নিপোত ব্যবহৃত হত। এই অগ্নিপোতের ভিতরে সহজে জ্বলে ওঠে এমন সব জিনিস ভাল করে ঠেসে দেওয়া হত। তার বাইরেটা হত সাধারণ জাহাজের মতোই—কাজেই শত্রুপক্ষ তাকে সন্দেহ করতে পারত না। তারপর সেই অগ্নিপোতখানার ভিতরে আগুন লাগিয়ে শত্রুদের নৌবাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত। শত্রুদের জাহাজগুলোর কাছে সে যখন যেত, তার সর্বাঙ্গ অগ্নিময় এবং সেই আগুন শত্রুদের জাহাজও অগ্নিময় করে তুলত। আজকালিকার যুদ্ধযাহাজ হয়। শীঘ্রগামী ও লৌহময়, তাই অগ্নিপোতের ব্যবহার এখন উঠে গেছে।

বোম্বেটেরা সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বড় বড় নৌকায় চড়ে বসল, অগ্নিপোতখানাকে সঙ্গে নিলে, তারপর মারাকেবো বন্দরের দিকে তারা অগ্রসর হল, অগ্নিপোতখানা যেতে লাগল আগে আগে।

তারা সন্ধ্যার সময়ে বন্দরে গিয়ে স্পানিয়ার্ড নৌ-বাহিনীকে দেখতে পেলে। এগুলো প্রকাণ্ড জাহাজই বটে এদের সঙ্গে সাধারণভাবে লড়াই করবার সাধ্য তাদের ছিল না।

দুই পক্ষই পরস্পরকে দেখতে পেয়ে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হল।

বোম্বেটেদের অগ্নিপোত দেখে স্পানিয়ার্ডরা তার সাংঘাতিক স্বরূপ আন্দাজ করতে পারলে না। তারা ভাবলে, একখানা অতিসাহসী বোম্বেটে জাহাজ একলাই তাদের আক্রমণ করতে আসছে। অতিসাহসের মজাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে তারা বিপুল উৎসাহে তাকে আক্রমণ করবার জন্যে বেগে তেড়ে এল।

কিন্তু তার কাছে এসেই তাদের চক্ষুস্থির! এ যে অগ্নিপোত, এর ভিতরে যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে এবং সে আগুন হুহু করে বেড়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে!

স্পানিয়ার্ডদের জাহাজ তিনখানা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল—কিন্তু তখন পালাবারও সময় নেই। অগ্নিপোত একেবারে সবচেয়ে বড় শত্রুজাহাজের পাশে গিয়ে লাগল—তখন তার ভিতরকার অগ্নি ঠিক যেন অসংখ্য জ্বলন্ত রক্তদানবের মতো মহাশূন্যে বাহু তুলে তাথৈ তাথৈ তাণ্ডবনৃত্য করছে! মাঝে মাঝে তার গর্ভস্থ বারুদ বিস্ফোরণের ভৈরবধ্বনি,—কান কালা হয়ে যায়!

দেখতে দেখতে স্পানিয়ার্ডদের অতিকায় জাহাজখানাও অগ্নিপোতের মতোই অগ্নিময় হয়ে উঠল! এবং দেখতে দেখতে তার একাংশ আগুনে পুড়ে জীর্ণ হয়ে সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল! স্পানিয়ার্ডদের দ্বিতীয় জাহাজখানা ভয়ে আর সেখানে দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি বন্দরের নিরাপদ অংশে ঢুকে পড়ে একেবারে কেল্লার তলায় গিয়ে উপস্থিত হল। পাছে সেখানা বোম্বেটেদের হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে স্পানিয়ার্ডরা নিজেরাই তাকে জলেল ভিতর ডুবিয়ে দিলে।

বোম্বেটের তৃতীয় জাহাজখানাকে পালাতেও দিলে না। তারা চারিদিক থেকে প্রবল বেগে তাকে আক্রমণ করলে। এমন দুর্জয় নৌ-বাহিনীর এই কল্পনাতীত পরিণাম দেখে স্পানিয়ার্ডরা তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে যে, বোম্বেটেদের সঙ্গে তারা মাথা ঠিক রেখে লড়তেও পারলে না। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

কাপ্তেন মর্গ্যানের এই বিচিত্র ও অপূর্ব জয়কাহিনী যখন ইংলণ্ডে গিয়ে পৌছল, তখন সেখানেও তার নামে ধন্য ধন্য রব উঠল। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে বোম্বেটেমহলে তার নাম হল যেন উপাস্য দেবতার নাম! কথায় বলে, ঢাল নেই—খাড়া নেই, নিধিরাম সর্দার! কিন্তু ঢালখাড়া না থাকলেও কেবল উপস্থিত বুদ্ধিবলে যে কি অসাধ্য সাধন করা যায়, নিধিরাম তা জানলে আজ তাকে ঠাট্টার পাত্র হতে হত না। কেবল বুদ্ধিবলেই কাপ্তেন মর্গ্যান আজ বিনা জাহাজে জলযুদ্ধ-বিজয়ী নাম কিনলে!

একটিমাত্র তীরে কেল্লা ফতে!

যেমন হয়, এবারেও তেমনই হল! জুয়াখেলা, মাতলামি, বদমাইশি! নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে, শত শত সাধুর জীবনদীপ নিবিয়ে দিয়ে, দুনিয়ার অভিশাপ কুড়িয়ে বোম্বেটেরা যে টাকা রোজগার করলে, জামাইকা দ্বীপে ফিরে এসে তা দুহাতে বদখেয়ালিতে উড়িয়ে দিতে তারা কিছুমাত্র বিলম্ব করলে না!

অল্পদিন পরেই দেখা গেল, বোম্বেটেদের পকেট আর বাজে না, তা একেবারেই ফোক্কা!

কাপ্তেন মর্গ্যান ছিল চালাক মানুষ। উড়নচণ্ডীর পুজো সে করেনি কোনওদিন খরচ করত বুঝেসুঝে। কাজেই এর মধ্যেই সে এমন দু'পয়সা জমিয়ে ফেলেছিল যে ইচ্ছে করলেই বাকি জীবনটা পায়ের উপরে পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে বসে খেতে পারত।

কিন্তু তার উচ্চাকাঙক্ষা সামান্য ছিল না। সে চায় এমন যশের শিখরে উঠে দাঁড়াতে, যার নাগাল কেউ পাবে না! দুনিয়ায় অনেক ছোট ডাকাত পরে রাজা মহারাজা হয়েছে, সাগরবাসী বোম্বেটেই বা কেন দেশমান্য মহাপুরুষ হতে পারবে না? হয়তো এমনই সব কথাই ভেবে মনটা তার উসখুস করছিল আবার সাগরে আর সাগরের তীরে তীরে কালবৈশাখীর মতো ছুটে যেতে!

এমন সময়ে এসে ধর্না দিলে তার লক্ষ্মীছাড়া চালা-চামুণ্ডার দল!

—কিহে, খবর কি? মুখ অত শুকনো কেন?

—সর্দার! আমরা খেতে পাচ্ছি না!

—বেশ তো, সেজন্য ভাবনা কি? টাকা রোজগার করো!

—আমরা তো সেইজন্যেই তোমার কাছে এসেছি সর্দার! আমরা খেতে পাচ্ছি না। আমরা টাকা রোজগার করতে চাই। আমরা আবার সমুদ্রে ভাসতে চাই।

মর্গ্যান হাসিমুখে বললে, আচ্ছা, তাই হবে। তোমরা প্রস্তুত হও।

—আমরা প্রস্তুত! পাওনাদার হতভাগারা ভারি ছোটলোক, তারা এখানে আমাদের আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না!

মর্গান যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। এবার সে যে আয়োজনে নিযুক্ত হল, তার আগে পৃথিবীতে আর কোনও পেশাদার বোম্বেটে স্বপ্নেও তা করেছে কিনা সন্দেহ। তার আয়োজনের বিপুলতা দেখলে তাকে আর বোম্বেটে বলেও মনে হবে না। ছোটখাট লুটপাট বা রাহাজানি যারা করে, পৃথিবী তাদের ডাকাত বলে ডাকে। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লং, আলেকজান্দার, সিজার, নাদির শা বা নেপোলিয়নকে ডাকাত বলতে সাহস করে না কেউ। এই হিসাবে, মর্গ্যানও আজ বেঁচে থাকলে, তাকে বোম্বেটে বলে ডাকলে হয়তো মানহানির মামলা আনতে পারত!

মর্গ্যানের এবারকার নৌ-বাহিনীতে জাহাজের সংখ্যা হল সাঁইত্রিশখানা! অ্যাডমিরালের— অর্থাৎ মর্গ্যানের—জাহাজে ছিল বাইশটা প্রকাণ্ডকামান ও ছয়টা ছোট পিতলের কামান। বাকি কোনওখানাতে বিশটা, কোনওখানাতে আঠারটা, কোনওখানাতে ষোলটা, এবং সবচেয়ে ছোট জাহাজেও কামানের সংখ্যাছিল অন্তত চারটে লোকও গেল অনেক। তাদের নাবিক ও চাকর-বাকর ছিল ঢের,কিন্তু তাদের বাদ দিলেও সৈনিক বা বোম্বেটেরা গুণতিতে দাঁড়াল পুরোপুরি দুইহাজার! এবারে মর্গ্যান নিজের দলকে আর বোম্বেটের দল বলতেও রাজি হল না, তার মতে তারা হচ্ছে ইংলণ্ডপতির কর্মচারী! যারা ইংলণ্ডের রাজার মিত্র নয়, তাদের সঙ্গেই সে নাকি লড়াই করতে যাচ্ছে! ইংলণ্ডের রাজার বিনা হুকুমের ও বিনা মাহিনার ভৃত্যু হয়ে তারা নিজেদের পাপকার্য অর্থাৎ নরহত্যা, দসুযতা ও লুণ্ঠনকেও বৈধ বলে প্রমাণিত করতে চলল।

তারপর আরম্ভ হল আগেকার দৃশ্যেরই পুনরাভিনয়—জলে স্পানিয়ার্ড জাহাজ দেখলেই তারা দখল করে, স্থলে স্পানিয়ার্ডদের শহর বা গ্রাম পেলেই

লুণ্ঠন করে, বন্দীদের মেরে ফেলে বা মারাত্মক শাস্তি দেয়। সেন্ট কাথারাইন দ্বীপও তারা অধিকার করলে। কিন্তু এসব কথা আর খুঁটিয়ে না বললেও চলবে।

আমরা এখানে বোম্বেটে মর্গ্যানের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনার কথাই বলব—অর্থাৎ পানামা অধিকার।

পানামার নাম জানে না, সভ্য পৃথিবীতে এখন এমন লোক বোধহয় নেই। সকলেই জানেন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে আছে এই নগরটি। পানামায় তখন ছিল স্পানিয়ার্ডদের প্রভুত্ব, এখন তা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পানামা নগরের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫৯,৪৫৮। কিন্তু পানামার পথঘাট বোম্বেটেদের ভাল করে জানা ছিল না। কাপ্তেন মর্গ্যান তখন পানামা অঞ্চলের কোনও ডাকাতকে খুঁজতে লাগল। পৃথিবীতে সাধু খুঁজে পাওয়াই প্রায়ই অসম্ভব ব্যাপার, অসাধুর সন্ধান পাওয়া তো অত্যন্ত সহজ! অবিলম্বেই পানামার তিন ডাকাতকে পাওয়া গেল—নৃশংস ও নিম্নশ্রেণীর ডাকত। লুটের লোভে তারা এক কথাতেই মর্গ্যানের পথপ্রদর্শক হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে।

পানামায় যেতে হলে চাগ্রে নদীর ধারে একটা দুর্ভেদ্য কেল্লা পার হয়ে যেতে হয়। মর্গ্যান আগে সেই কেল্লাটা দখল করবার জন্যে সৈন্য ও সেনাপতি পাঠিয়ে দিলে। যেমন নেতা, তেমনই সেনাপতি। তার নাম কাপ্তেন ব্রোডলি, এ অঞ্চলে অগুণতি ডাকাতি করে সে দুর্নাম কিনতে পেরেছে যথেষ্ট। তিনদিন পরে সে চাগ্রে দুর্গের কাছে গিয়ে হাজির হল—স্পনিয়ার্ডর তাকে সেন্ট লরেন্স দুর্গ বলে ডাকত। এই দুর্গটি উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত—তার চারিদিকে শক্ত পাথরের মতো পাঁচিল। পাহাড়ের শিখরদেশ দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝখানে ত্রিশফুট গভীর এক খাল। সেই খালের উপরকার টানা সাঁকোর সাহায্যে দুর্গের একমাত্র প্রবেশপথের ভিতরে ঢোকা যায়। বড় দুর্গের তলায় আছে আবার একটা ছোট—কিন্তু রীতিমতো মজবুত কেল্লা, —আগে সে কেল্লা ফতে না করে নদীর মুখে প্রবেশ করাই অসম্ভব।

গুণধর বোম্বেটেদের সঙ্গে চোখের দেখা হতেই স্পানিয়ার্ডরা মুষলধারে গোলাগুলি বৃষ্টি শুরু করলে। কেল্লা তখনও মাইল তিনেক তফাতে। পথঘাট ধূলোকাদায় ভরা, চলতে বড় কষ্ট। তবু বোম্বেটেরা দাঁড়াল না, তারা যত এগোয় স্পানিয়ার্ডরা ততই পিছিয়ে যায়। এইভাবে অগ্রসর হয়ে বোম্বেটের দল দুর্গের কাছে খোলা জমিতে এসে পড়ল।

ইতিমধ্যেই তাদের লোকক্ষয় হয়নি বড় কম। কিন্তু এখন তাদের বিপদ আরও বেড়ে উঠল। খোলা জমি, শত্রুপক্ষের গুলির ধারা সিধে তাদের দিকে ছুটে আসছে, কোথাও এমন ঠাই নেই যে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়। সামনেই কামানের সারের পর সার সাজিয়ে খাড়া হয়ে আছে বিরাট ওই দুর্গ, দেখলেই মনে হয় ওকে দখল করা অসম্ভব। এবং এই মুক্ত স্থানে আর অপেক্ষা করাও সম্ভবপর বা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন হয় পালানো, নয় আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই! পালালে অপমান, এগুলেও পরাজয় বা মৃত্যু!

হতাশভাবে গোলোকধাঁধায় পড়ে বোম্বেটেরা অনেকক্ষণ পরামর্শের পর স্থির করল—দুর্গ আক্রমণ করতেই হবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন!..এক হাতে তরবারি ও আর এক হাতে বোমা নিয়ে তারা অগ্রসর হতে লাগল অকুতোভয়ে!

স্পানিয়ার্ডরা দুর্গপ্রাকার থেকে কামান ছুড়ছে, ছুড়ছে আর ছুড়ছেই! বোম্বেটেরা হতাহতের ভিতর দিয়ে পথ করে যখন আরও কাছে এগিয়ে এল, স্পানিয়ার্ডরা তখন চিৎকার করে বললে, ওরে ইংরেজ কুত্তার দল! তোরা হচ্ছিস ভগবান আর আমাদের রাজার শত্রু! আয়, এগিয়ে আয়, তোদের পিছনে যারা আছে তারাও এগিয়ে আসুক! তোদের আর এ যাত্রা পানামায় যেতে হচ্ছে না।

বোম্বেটেরা কেল্লার পাঁচিলের উপরে ওঠবার চেষ্টা করলে—কিন্তু বৃথা গরম গরম গোলার ঝড়ে ও গুলির বৃষ্টিতে জীবন্ত সব দেহ মুহূর্তে মৃতদেহে পরিণত হল! তখন সে রাত্রের মতো তারা যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে পালিয়ে এল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধ আরম্ভ! বোম্বেটেরা বোমা ছুড়ে যখন কেল্লার পাঁচিলকে কাবু করবার চেষ্টা করছে তখন আশ্চর্য এক কাণ্ড হল! তখন বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হলেও ধনুকের ব্যবহার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। স্পানিয়ার্ডরা বন্দুকের সঙ্গে ধনুকও ছুঁড়ছিল। হঠাৎ একটা তীর এসে একজন বোম্বেটের দেহকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করেই সে সেই তীরটা নিজের বুকের উপর থেকে একটানে আবার উপড়ে ফেললে। তারপর তার কি কেয়াল হলো খানিকটা তুলো নয়ে তীরের গায়ে জড়িয়ে সেটা নিজের বন্দুকের নলচের ভিতরে পুরে দুর্গ লক্ষ্য করে সে গুলি ছুড়লে গুলির সঙ্গে তীরটাও বন্দুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে দুর্গের ভিতরে গিয়ে পড়ল। দুর্গের ভিতরে যেসব বাড়ি ছিল সেগুলোর ছাদ হচ্ছে তালপাতায় ছাওয়া। তীরসংলগ্ন জ্বলন্ত তুলোর গুণে দুই তিনখানা বাড়ির ছাদে আগুনের শিখা দেখা দিলে। যুদ্ধে ব্যস্ত স্পানিয়ার্ডরা সেদিকে নজর দেবার সময় পেলে না। সকলের অজ্ঞাতসারেই সেই অদ্ভুত উপায়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি একরাশ বারুদের স্তূপকে স্পর্শ করলে,—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আগ্ন্যুৎপাত, বিষম বারুদ-গর্জন, বহুকণ্ঠের সচকিত চিৎকার ও স্পানিয়ার্ডদের সভয়ে ছুটোছুটি যুদ্ধ ভুলে সকলেই তাড়াতাড়ি আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বোম্বেটেরা এমন মহা সুযোগ ত্যাগ করলে না, দৈবের অনুগ্রহে আবিষ্কৃত পূর্বকথিত উপায়ে তারা দুর্গের আরও নানা জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করলে। স্পানিয়ার্ডদের ভয়, কাতরতা ও ব্যস্ততা বেড়ে উঠল—একটা আগুন নেবায় তো আরও দু'জায়গায় দপদপ করে নূতন আগুন জ্বলে উঠে।

সেই আগুনে অবশেষে অনেক জায়গায় দুর্গের বেড়া উড়েপুড়ে গেল এবং প্রাচীরের বিরাট মৃত্তিকাস্তূপ ধসে নিচেকার খাল ভরাট করে ফেললে! বোম্বেটেরা তার সাহায্যে অনায়াসে খাল পার হয়ে দুর্গের প্রথম প্রাচীরের ভিতরে গিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

তবু যুদ্ধ থামল না—গভীর রাত্রে মানুষেরা স্বজাতিকে ধ্বংস করবার জন্য বন্যপশুর মতো যুঝতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোম্বেটেদের কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। সমস্‌ত চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে বীর স্পানিয়ার্ডরা আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় ভেবে দলে দলে জলে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে। দুর্গের গভর্নরও জীবন থাকতে আত্মদান করলেন না,বোম্বেটেরা যখন তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারলে, তখন তাঁর আত্মা পরলোকে। দুর্গের তিনশ চোদ্দজন লোকের মধ্যে জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া গেল মাত্র ত্রিশজন লোক—তাদের মধ্যেও কুড়িজন আহত। কেবল নয়জন লোক পানামার গভর্নরের কাছে খবর দিতে গেছে—বাকি সবাই মৃত! বোম্বেটেদেরও ক্ষতি বড় সামান্য নয়। তাদের একশজন হত ও সত্তরজন আহত হয়েছে।

জীবিত স্পানিয়ার্ডরা শারীরিক যন্ত্রণার চোটে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, পানামার গভর্নর বোম্বেটেদের আগমনের সব খবরই আগে থাকতেই পেয়েছেন এবং আগে থাকতেই তাদের ভাল করে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দস্তুরমতো প্রস্তুত হয়ে আচেন। চাগ্রে নদীর ধারে সর্বত্রই তাঁর সৈনরা অপেক্ষা করছে এবং সর্বশেষ তিনিও অপেক্ষা করছেন তিন হাজার ছয়শ সৈন্য নিয়ে।

অতঃপর বোম্বেটেদের উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে কাপ্তেন মর্গান তার বাকি বারশত সৈন্য নিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে। পানামা বিজয়ের পথের কাঁটা দূর হয়েছে, সকলের মুখেই হাসি আর ধরে না।

যে একশ বোম্বেটে অর্থলোভে সেখানে প্রাণ দিলে, জীবিত সঙ্গীদের মুখের হাসি দেখবার সুযোগ তাদের দেহহীন আত্মারা সেদিন পেয়েছিল কিনা কে জানে!

পানামার যুদ্ধ

১৬৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে কাপ্তেন মর্গ্যান চাগ্রে দুর্গ ছেড়ে পানামা নগরের দিকে অগ্রসর হল সদলবলে।

যাত্রা শুরু হল জলপথে, নদীতে নৌকোয় চড়ে। যতই অগ্রসর হয়, দেখে নদীর দুই নির্জন তীর মরু-শ্মশানের মতো হা হা করছে, শস্যক্ষেতে কৃষক নেই, গ্রামে বাসিন্দা নেই, পথে কুকুরবিড়াল নেই, কোথাও জীবনের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই!স্পানিয়ার্ডরা সবাই পালিয়েছে তাদের ভয়ে এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেছে জীবনের যত কিছু আনন্দ!

প্রথম থেকেই ঘটল খাদ্যাভাব। মর্গ্যান সঙ্গে বেশি খাবার নিয়ে ভারগ্রস্ত হতে চায়নি, ভেবেছিল পথে লোকালয়ে নেমে তরোয়াল উঁচিয়ে বিনামূল্যে প্রচুর খাদ্য আদায় করবে। তার সে আশায় ছাই পড়ল। মানুষ নেই, খাবারও নেই। শূন্য উদরের অভাব ভোলবার জন্যে বোম্বেটেরা তামাকের পাইপ মুখে দিয়ে অন্যমনস্ক হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তারপর জলপথে নৌকোও হল অচল। বৃষ্টির অভাবে নদী ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। নৌকো ছেড়ে বোম্বেটেরা ডাঙায় নামল। চলতে চলতে তারা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল, শত্রুরা তাদের আক্রমণ করতে আসুক! কারণ শত্রুরা এলে খাবারও তাদের সঙ্গে আসবে এবং শত্রু মেরে তারা সেই খাবারে ভাগ বসাতে পারবে!

আজ যাত্রার চতুর্থ দিবস। আজশত্রুদের বদলে তাদের পরিত্যক্ত একটা ছাউনি পাওয়া গেল, তার ভিতরে পড়েছিল অনেকগুলো চামড়ার ব্যাগ,হয়তো ভুলে ফেলে গেছে! ক্ষুধার্ত বোম্বেটেরা পরম আনন্দে সেই শুকনো চামড়ার ব্যাগগুলো নিয়েই কড়াকড়ি করতে লাগল—গরম জলে সিদ্ধ ও নরম করে সেই ব্যাগের চামড়াই খেয়ে আজ তারা পেটের জ্বালা নিবারণ করবে!

পঞ্চম দিনে তারা আর এক জায়গায় এসে স্পানিয়ার্ডদের আর একটা পরিত্যক্ত ছাউনি আবিষ্কার করলে। কিন্তু হায় রে, একটা চামড়ার ব্যাগ পর্যন্ত এখানে পাওয়া গেল না! কী দুর্ভাগ্য! এ হতচ্ছাড়া দেশে কি একটা জ্যান্ত কুকুর বা বিড়াল পর্যন্ত ল্যাজ নাড়ে না? নিদেন দুচারটে ইঁদুর?

লোকে গালাগলিতে জুতো খেতে বলে। তারাও হয়তো জুতো খেতে রাজি ছিল—ব্যাগ আর জুতোর চামড়ায় তফাৎটা কি? কিন্তু জুতোগুলোও খেয়ে ফেললে খালি পায়ে এইসব কাটাভরা জঙ্গল আর কাঁকরভরা উঁচুনিচু পথ দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে ধনরত্ন লুটতে যাবে কেমন করে?

তারা বাংলাদেশের সেপাই হলে জুতোগুলো এত সহজে রেহাই পেত না। বাংলায় খালিপায়ে কাঁকর বেঁধে না, কাঁটা ফোটে না!

অনেকে বোধ করি অবাক হচ্ছেন? কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে? পেটের জ্বালা কেমন, দুর্ভিক্ষের দেশ তা জানে। পেটের জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংসও বাদ দেয় না। ইতালির এক কারারুদ্ধ কাউণ্ট নাকি ক্ষিধের চোটে নিজের ছেলের মাংসও খেতে ছাড়েননি।

...এই নির্জন মরু-শ্মশানে দেবতার হঠাৎ এ কী আশীর্বাদ! কলির দেবতারাও হয়তো ভীতু, কারণ প্রায়ই তারা অসাধুর দিকেই মুখ তুলে চান। বোম্বেটেরা পথের মাঝে এক পাহাড়ের গুহা আবিষ্কার করলে, তার ভিতরে পাওয়া গেল খাবারের ভাণ্ডার—এমন কি ফল আর মদ পর্যন্ত! সম্ভবত স্পানিয়ার্ডরা পালাবার সময়ে এগুলো এখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল!

সবাই উপোসী শকুনির মতো সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করলে। ভাল করে না হোক, পেট তবু কতকটা ঠাণ্ডা হল।

যষ্ঠ দিনেও পথের শেষ নেই। কখনও জলপথ, কখনও স্থলপথ,—যখন যেমন সুবিধা। আবার অশ্রান্ত ক্ষুধার আবির্ভাব। চারিদিক তেমনই নিরালা আর নিঝুম, যারা পালিয়েছে তারা খাবারের গন্ধটুকু পর্যন্ত চেঁচেমুছে নিয়ে পালিয়েছে!

বোম্বেটেরা মনে মনে কেবল শক্রকে ডাকতে লাগল। শত্রু! সেও আজ মিত্রের মতো! কেউ গাছের পাতা ছিড়ে ও কেউ মাঠের ঘাস উপড়ে মুখে পুরে উদরের শূন্যতাকে ভরাবার চেষ্টা করতে লাগল। স্পানিয়ার্ডরা লড়ে তাদের এমন জব্দ করতে পারত না! গা ঢাকা দিয়ে তারা তাদের কী মারাত্মক শাস্তিই দিচ্ছে! প্রায় দেড়শ বৎসর পরে নেপোলিয়ন এবং খ্রিস্ট জন্মাবারও আগে পারস্যের এক সম্রাট রুশদেশ আক্রমণ করতে গিয়ে এমনই শাস্তিই পেয়েছিলেন।

শয়তানদের উপরে আবার দেবতার দয়া হল! এবারে এক চাষার বাড়িতে তারা পেলে ভুট্টার ভাণ্ডার। ভাড়ার লুটে তারা যত পারলে খেলে, বাকি মাল সঙ্গে করে নিয়ে চলল। কিন্তু বারশ ক্ষুধার্ত ডাকাতের কাছে সে ভুট্টার অস্তিত্ব আর কতক্ষণ ক্ষুধ মিটাল না, তবে আপাতত প্রাণ রক্ষা হল বটে।

সপ্তম দিনে দেখা গেল—দূরে একটা ছোট শহর, তার উপরে উড়ছে ধোঁয়া। বোম্বেটেরা আনন্দে নেচে উঠল। কারণ বিনা কার্য হয় না, আগুন বিনা ধোঁয়া হয় না। আর আগুন মানুষ ছাড়া আর কেউ জুলে না। বাসিন্দারা নিশ্চয়ই রাঁধছে—ও ধোয়া উনুনের ধোঁয়া।

পাগলের মতো তারা শহরের দিকে ছুটল—শূন্যে আকাশকুসুম চয়ন করতে করতে। এই তো, শহর তাদের সামনেই!

কারণ বিনা কার্য হয় না, আগুন বিনা ধোঁয়া হয় না। আর, আগুন মানুষ ছাড়া আর কেউ জ্বলে না।.হ্যাঁ, এ আগুনও মানুষই জ্বেলেছে বটে, স্পানিয়ার্ডরা শহর ছেড়ে অদৃশ্য হয়েছে এবং যাবার সময়ে শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। বোম্বেটেরা এখানে ক্ষুদ্রকুড়োটি পর্যন্ত পেলে না। একটা জ্যান্ত বা মরা কুকুর বিড়ালও শক্ররা রেখে যায়নি।

একটা আস্তাবলে পাওয়া গেল কেবল প্রচুর মদ আর পাউরুটি। অমনি তারা সারি সারি বসে গেল ফলারে! কিন্তু পানাহার শুরু করতেই তাদের শরীর যাতনায় দুমড়ে পড়ল। চারিদিকে রব উঠল—শত্রুরা খাবারে বিষ মিশিয়ে রেখে

গেছে? ভয়ে আঁতকে উঠে থুথু করে তারা তখনই মুখের খাবার ধুলোয় ফেলে দিলে।

অষ্টম দিনে বোম্বেটেরা পানামা নগরের খুব কাছে এসে পড়ল। ঘণ্টাদশেক পথ চলার পর তারা বনের ভিতরে একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাদের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বৃষ্টি হতে লাগল। তীর দেখেই বোঝা গেল, রেড ইন্ডিয়ানরাও স্পানিয়ার্ডদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। বোম্বেটেরা বেজায় ভয় পেয়ে গেল, কারণ এ সব তীর যারা ছুড়ছে তাদের টিকিট পর্যন্ত কারুর নজরে পড়ল না।

বোম্বেটেরা বনপথে এগুবার চেষ্টা করলে, অমনি রেড ইন্ডিয়ানরা বিকট চিৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে এল। কিন্তু একে তাদের দল বোম্বেটেদের মতো পুরু নয়, তার উপরে তাদের আগ্নেয় অস্ত্রেরও অভাব, সুতরাং বেশিক্ষণ তারা যুঝতে পারলে না। রেড ইন্ডিয়ান সর্দার আহত হয়ে পড়ে গিয়েও আত্মসমর্পণ করলে না, কোনওরকমে একটু উঠে বসে একটা বোম্বেটের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করলে, কিন্তু পর মুহূর্তেই পিস্তলের গুলিতে তার যুদ্ধের শখ এ জীবনের মতন মিটে গেল!

খানিক পরেই একটা বনের ভিতরে পাওয়া গেল দুটো পাহাড়। একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বোম্বেটেরা দেখলে, অন্য পাহাড়টার উপরে চড়ে বসে আছে স্পানিয়ার্ড ও রেড ইন্ডিয়ানরা। তারা তখন নিচে এল। তাই দেখে শত্রুরাও নিচে নামতে লাগল। বোম্বেটেরা ভাবলে, এইবারে বুঝি আবার যুদ্ধ বাধে! কিন্তু শত্রুরা এখানে লড়াই না করেই কোথায় সরে পড়ল!

সে রাত্রে বোম্বেটেদের বিষের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করবার জন্যে আকাশে দেখা দিলে ঘনঘটা এবং তারপরেই নামল অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। নিরাশ্রয়ের মতো সেই ঝড়বাদলকে তাদের মাথা পেতেই গ্রহণ করতে হল। পরদিন

সকালে—অর্থাৎ যাত্রার নবম দিনে প্রায় অনাহারে জলে ভিজে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তারা কাদা ভাঙতে ভাঙতে আবার অগ্রসর হল।

আচম্বিতে পথ সমুদ্রতীরে এসে পড়ল এবং দেখা গেল খানিক তফাতে কতকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। বোম্বেটেরা তখনই নৌকোয় চেপে দেখতে গেল, সে সব দ্বীপের ভিতরে কি আছে!

সে দ্বীপে পাওয়া গেল গরু, মোষ, ঘোড়া এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় গাধা। বোম্বেটেরা মনের খুশিতে তাদের দলে দলে বধ করতে আরম্ভ করলে। তখনই তাদের ছাল ছাড়িয়ে আগুনের ভিতরে ফেলে দেওয়া হল। মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্তও তারা অপেক্ষা করতে পারলে না, ক্ষুধার চোটে প্রায় কাচা মাংসই চিবিয়ে খেতে লাগল। আজ এতদিন পরে এই প্রথম তারা মনের সাধু্ে পেট ভরে খাবার সুযোগ পেলে!

খাবার খেয়ে নূতন শক্তি পেয়ে মর্গ্যানের হুকুমে আবার তারা পথে নামল। সন্ধ্যা যখন হয় হয় তখন দেখা গেল, দূরে প্রায় দুইশত স্পানিয়ার্ড তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে এবং তাদের পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে, পানামা শহরের একটা উঁচু গির্জার চুড়ো।

বোম্বেটেরা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিপুল উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল—চারিদিকে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া। এইবারে তাদের পথশ্রম, রোদে পোড়া, জলে ভেজা ও পেটের জ্বালা শেষ হল। আসল যুদ্ধ এখনও হয়নি বটে, নগর এখনও নাগালের বাইরে বটে, কিন্তু সে অসুবিধা বেশিক্ষণ আর ভোগ করতে হবে না! আর তাদের বাধা দেয় কে?.. সে রাতের মতো তাবু গেড়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। শত্রুদের পঞ্চাশজন অশ্বারোহী এসে দূরে থেকেই চেচিয়ে শাসিয়ে গেল—ওরে পথের কুকুরের দল! এইবারে আমরা তোদের বধ করব!—তারপরেই পানামা নগর থেকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হল—কিন্তু মিথ্যা সে

গোলাগুলোর গোলমাল, কারণ গোলাগুলোর একটাও তাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছল না।

দশম দিনের সকালে বোম্বেটেরা বসে বসে নিশ্চিন্তপ্রাণে খানা খেয়ে নিলে—অনেকেরই এই শেষ খানা!

তারপরেই জেগে উঠল তাদের জয়ঢাক আর রণভেরীগুলো। বোম্বেটেরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সমতালে পা ফেলতে ফেলতে অগ্রসর হল।

দেখা গেল, দূরে কামানের সারের পর সার সাজিয়ে স্পানিয়ার্ডরা যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে। তারা জানে, বোম্বেটেরা এই পথেই আসবে।

এমন সময়ে সেই পথপ্রদর্শক ডাকাতরা মর্গ্যানকে ডেকে বললে, হুজুর , এ পথে অনেক কামান, অনেক বাঁধা! বনের ভিতর দিয়ে আর একটা পথ আছে, সেটা ভাল নয় বটে কিন্তু সেখান দিয়ে খুব সহজেই শহরে পৌঁছানো যাবে।

মর্গ্যান তাদের কথামতোই কাজ করলে—বোম্বেটেরা অন্য পথ ধরলে। স্পানিয়ার্ডদের প্রথম চাল ব্যর্থ হল। বোম্বেটেরা যে হঠাৎ পথ বদলাবে, এটা তারা আশা করেনি। তাদের সমস্ত আয়োজন হয়েছিল এইখানেই। বাধ্য হয়ে তারাও অন্য পথে বোম্বেটেদের বাধা দেবার জন্যে ছুটল,—তাড়াতাড়িতে ভারি ভারি কামানগুলোকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাবারও সময় পেলে না। এই ভুল হল তাদের সর্বনাশের কারণ।

বোম্বেটেরা সভয়ে দেখলে, শত্রুর যেন শেষ নেই! কাতারে কাতারে লোক তাদের আক্রমণ করবার জন্যে বিকট চিৎকারে ধেয়ে আসছে—তাদের পিছনে আবার কাতারে কাতারে সৈন্য। এত শত্রুসৈন্য এক জায়গায় তারা আর কখনও দেখেনি! অশ্বারোহী, পদাতিক, কামানবাহী —কিছুরই অভাব নেই!

তার উপরে আছে আবার হাজার হাজার বুনো মোষের পাল—রেড ইন্ডিয়ান ও কাফ্রিরা মোষগুলোকে তাদের দিকেই তাড়িয়ে আনছে। সেকালে

ভারতের রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে ভাবে হাতির পাল ব্যবহার করতেন, এরা এই বুনো মোষগুলোকে ব্যবহার করবে সেই ভাবেই!

একটা ছোট পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোম্বেটেরা শত্রুদের এই বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করতে লাগল। এখন তাদের পালাবারও পথ বন্ধ। পিছনে জেগে আছে জনহীন, আশ্রয়হীন ও খাদ্যহীন সেই নির্দয় শ্মশানভূমি নিজেদের বিপদসঙ্কুল অবস্থার কথা ভেবে বোম্বেটেরা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। তারা স্থির করলে—হয় মরবে, নয় মারবে। তারা পালাবেও না, আত্মসমর্পণও করবে না!

রণভেরী বেজে উঠল। মর্গান সর্বাগ্রে দুইশত বাছা বাছা সুদক্ষ ফরাসি বন্দুকধারীকে দলের আগে আগে পাঠিয়ে দিলে।

স্পানিয়ার্ডরও অগ্রসর হতে হতে চিৎকার করে উঠল—ভগবান আমাদের রাজার মঙ্গল করুন!

প্রথমেই আসছে শত্রুদের অশ্বারোহী সৈন্যদল। কিন্তু খানিক এগিয়েই তারা এক জলাভূমির উপরে এসে পড়ল—সেখানে ঘোড়া নিয়ে ঘোরাফেরাই দায়!

বোম্বেটে বন্দুকধারীরা এ সুযোগ অবহেলা করলে না, তারা মাটির উপরে এক হাঁটু রেখে বসে,টিপ ঠিক করে বন্দুক ছুঁড়লে এবং অনেকেরই লক্ষ্য হল অব্যর্থ ঘোড়সওয়াররা জলাভূমির ভিতরে হাঁকপাক করে বেড়াতে লাগল এবং গুলির পর গুলির চোটে হয় ঘোড়া নয় সওয়ার হত বা আহত হয়ে নিচে পড়ে যেতে লাগল।

অশ্বারোহীদের আক্রমণে ফল হল না দেখে, বোম্বেটেদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে বুনো মোষগুলো লেলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মোষেদের বেশির ভাগই গোলাগুলির আওয়াজে চমকে ও ভড়কে অন্যদিকে ছুটে পালাল, যারা এগিয়ে গেল তাদের বেশি রাগ হল মানুষের বদলে রঙিন নিশানগুলোরই উপরে। তারা

পতাকা লক্ষ্য করে তেড়ে এল এবং সেই ফাকে বোম্বেটেরা তাদের গুলি করে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিলে।

তারপর আরম্ভ হল বোম্বেটেদের সঙ্গে স্পানিয়ার্ড পদাতিকদের লড়াই। বোম্বেটেরা জানত, হারলে তারা কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না। তাই তারা এমন মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল যে, একএকজন বোম্বেটেকে তিন-চারজন স্পানিয়ার্ড মিলেও কায়দায় আনতে পারলে না। বোম্বেটেদের এক হাতে পিস্তল, আর এক হাতে তরোয়াল,—দূরের শত্রুকে গুলি ছুড়ে মারে, কাছে পেলে বসিয়ে দেয় তরোয়ালের কোপ! তারা অসম্ভব শত্রু! ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ। স্পানিয়ার্ডরা যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল—ছয়শজন মৃত সঙ্গীর দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে।

এত আয়োজনের পর এত শীঘ্র লড়াই শেষ হয়ে যাবে, এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। পানামার পতন হল।

পলাতক বিজয়ী নেতা

খুব সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যেই চেঙ্গিজ খাঁ, আলেকজান্দার, সিজার ও নেপোলিয়ন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে পারতেন বলেই তাদের আজ এত নাম।

তাঁদের সঙ্গে বোম্বেটে মর্গ্যানের তুলনাই চলে না। কিন্তু মর্গ্যানের পানামা বিজয় যে বিশেষ বিস্ময়জনক ব্যাপার, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

পূর্বকথিত দিগ্বিজয়ীরা এক বা একাধিক সমগ্র জাতির সাহায্য পেয়েই বড় হয়েছিলেন।

কিন্তু মর্গ্যান হচ্ছে কতকগুলো জাতিচ্যুত, সমাজ থেকে বিতাড়িত, নীতিজ্ঞানশূন্য, হীন বোম্বেটের সর্দার। এবং তাদের শত্রুরা হচ্ছে অসংখ্য স্পানিয়ার্ড সৈনিক, প্রবল পরাক্রান্ত স্পেন সাম্রাজ্যের অতুলনীয় শক্তি তাদের পিছনে, অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যাধিক্যে বোম্বেটেদের চেয়ে তারা ঢের বেশি বলিষ্ঠ। তবু যে তারা এত অনায়াসে হার মানতে বাধ্য হল, এটা একটা মস্ত স্মরণীয় ব্যাপার বলে স্বীকার করতেই হবে।

পানামার পতন হল। তারপর যেসব কাণ্ড আরম্ভ হল পাঠকরা তা কল্পনাই করতে পারছেন। বোম্বেটেরা প্রথমে দু'চোখো হত্যা করতে লাগল—সৈনিক, সাধারণ নাগরিক, কফ্রি, বালক, নারী ও শিশু—খাড়া পড়ল নির্বিচারে সকলেরই উপরে। বোম্বেটেরা দলে দলে ধর্মযাজক বা পাদ্রী বন্দি করলে, প্রথমে তাদেরও পাদ্রী হত্যা করতে বিবেকে বাধল, তাই তাদের ধরে মর্গ্যানের কাছে নিয়ে গেল।

মর্গ্যান পাদ্রীদের কান্নায় কর্ণপাত না করে বললে, "মারো, মারো, সবাইকে মারো" লুণ্ঠন চলতে লাগল। পলাতকরা অনেক ধনরত্ব নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তখনও শহরে ছিল প্রচুর ঐশ্বর্য। সব পড়ল বোম্বেটেদের হাতে—হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তো, সোনারুপোর আসবাব ও তাল এবং টাকাকড়ি আর যা কিছু।

তারপর মর্গ্যান জনকয়েক বোম্বেটেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, তোমরা চুপি চুপি শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসো।

কেউ কিছু টের পাবার আগেই একদিন অকস্মাৎ সেই বৃহৎ নগরের উপরে অগ্নির রাঙা টকটকে জিভ লকলক করে জ্বলে উঠল। স্পানিয়ার্ডরা সবাই সেই আগুন নেবাতে ছুটল, এর মধ্যে তাদের সর্দারের হাত আছে না জেনে অনেক বোম্বেটেও তাদের সাহায্য করতে গেল,কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না—দেখতে দেখতে বিরাট অগ্নির বেড়াজালের মধ্যে গোটা শহরটাই ধরা পড়ল! বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা, কারুকার্য করা গির্জা, মঠ, গৃহস্থও গরিবের বাড়িসমস্তইগেল আগুনের গর্ভে। সেই অগ্নিকাণ্ডে ছোট-বড় আট হাজার বাড়ি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল!

মর্গ্যান রটিয়ে বেড়াল—"স্পানিয়ার্ডরাই এই কাণ্ড করেছে!" লুণ্ঠনের পর নির্যাতন। গুপ্তধনের সন্ধান। নির্যাতনের শতশত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা এখানে দেখাচ্ছি: জনৈক ধনী ভদ্রলোক বোম্বেটেদের ভয়ে ধনরত্ননিয়ে পালিয়ে যান। তার গরিব চাকরটা মনিবের একটা দামী পোষাক পেয়ে বুদ্ধির দোষে সেটা নিজে পরে ফেললে।কাঙলের ঘোড়ারোগ বরাবরই সাংঘাতিক। বোম্বেটেরা তাকে দেখেই ধরে নিলে, সে কোনও মস্তবড় লোক।

তার কাছ থেকে তারা টাকা দাবি করলে। সে কোথেকে টাকা দেবে? সে বললে, আমি চাকর ছাড়া আর কিছু নই। এ পোষাক আমার মনিবের।

বোম্বেটেরা বিশ্বাস করলে না। তখন প্রথমেই তারা সে বেচারার হাত দুখানা দুমড়ে একেবারে ভেঙে দিলে। তাতেও মনের মতো জবাব না পেয়ে তারা সেই চাকরের কপালের উপর দড়ির ফাঁস লাগিয়ে এমন জোরে পাকাতে লাগল যে, চামড়ায় টান পড়ে তার চোখদুটো ডিমের মতো বড় হয়ে ঠিকরে পড়বার মতো হয়ে উঠল। তখনও গুপ্তধনের সন্ধান মিলল না। তারপর তাকে শূন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে ঘুষি ও চাবুক মারা হতে লাগল। তার নাক ও কান কেটে

নেওয়া হল—জ্বলন্ত খড় নিয়ে মুখে ছাকা দেওয়া হতে লাগল। শেষকালে সে এই পৈশাচিক যাতনা থেকে মুক্তি পেলে বর্শার আঘাতে। অভাগা মরে বাঁচল।

তিন হস্তা পরে দুরাত্মা মর্গ্যান পানামার ভস্মস্তূপ ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলে।

সঙ্গে করে নিয়ে চলল ছয়শ বন্দীকে—প্রচুর টাকা না পেলে সে তাদের ছাড়তে রাজি নয়। সেই ছয়শত স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ বন্দীর মিলিত ক্রন্দনে আকাশ যেন ফেটে যাবার মতো হয়ে উঠল।

ভেড়ার পালের মত বন্দীদের আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে বোম্বেটেরা অগ্রসর হল। মর্গ্যানের হুকুমে বন্দীদের পানাহারও প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হল।

অনেক নারী আর সইতে না পেরে মর্গ্যানের পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে কাতর মিনতির স্বরে বললে, ওগো, আর আমরা পারি না। আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দিন—আমরা স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যাই! আমাদের যথাসর্বস্ব গেছে, তবু পাতার কুঁড়ে তৈরি করে স্বামী-পুত্রের সঙ্গে বাস করব।

নিরেট লোহার মতো সুকঠিন মর্গান বললে, আমি এখানে কান্না শুনতে আসিনি—এসেছি টাকা রোজগার করতে। টাকা দিলেই ছাড়ান পাবে, নইলে সারাজীবন বাদী হয়ে থাকবে!

সমুদ্রের ধারে গিয়ে মর্গান বোম্বেটেদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ করতে বসল। নিজের মনের মতো হিসাব করে সকলকে সে অংশ দিলে।

কিন্তু সে অংশ সন্দেহজনক। এতবড় শহর লুটে এত পরিশ্রমের পর এই হল পাওনা, এত কম টাকা!

প্রত্যেক বোম্বেটে বিষম রাগে গরগর করতে লাগল। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস হল, মর্গ্যান তাদের ফাঁকি দেবার জন্যে বেশিরভাগ দামী মালই সরিয়ে ফেলেছে! মর্গ্যানকে তারা মুখের উপরে কিছু খুলে বলতে সাহস করল না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই মারমুখো হয়ে রইল।

মর্গান বুঝলে, গতিক সুবিধার নয়। এরা প্রত্যেকেই মরিয়া লোক, যেকোনও মুহূর্তে সে বিপদে পড়তে পারে।

আচম্বিতে একদিন দেখা গেল, চারখানা জাহাজ ও জনকয়েক খুব বিশ্বাসী লোক নিয়ে চোর মর্গ্যান একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! একরাত্রেই সে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে চলে গেল—বোম্বেটেরা তাকে ধরতে পারলে না। ধরতে পারলে কি হত বলা যায় না।

তারপর? তারপর মর্গ্যান আর কখনও বোম্বেটেদের সর্দার হয়নি। হবার উপায়ও ছিল না, হবার দরকারও ছিল না।

মর্গ্যানের চূড়ান্ত সৌভাগ্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার নামডাক শুনে ইংলন্ডের রাজা তাকে দেখতে চাইলেন। তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেন। তাকে স্যার উপাধি দিলেন। তাকে জামাইকা দ্বীপের গভর্নর করে পাঠালেন। চোর, জোচ্চোর, খুনী, চরিত্রহীন, ডাকাত ও বোম্বেটে মর্গ্যান হল হাজার হাজার সাধুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—স্যার হেনরি মর্গান!

বিশ্বের শিয়রে মহাবিচারক মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়েন!

কিন্তু স্পানিয়ার্ডদেরও শাস্তির দরকার হয়েছিল। তাদের ভীষণ অত্যাচারে আমেরিকা নিদারুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করছিল। ভগবানের মূর্তিমান অভিশাপেরই মতো হয়তো তাই মর্গান লোলোনেজ, পর্তুগীজ ও ব্রেজিলিয়ানোর দল এসে আবির্ভূত হয়েছিল স্পানিয়ার্ডদের মাঝখানে।